৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ১১+১২

টপিক:

✓ **ভাব-সম্প্রসারণ ও রচনা-১:**

ভাব-সম্প্রসারণ (সাধারণ আলোচনা ও নিয়মাবলি), রচনা (উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিবেশ বিষয়ক, সামাজিক বিষয়াবলি, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক, সাম্প্রতিক বিষয়াবলি)

✓ **সারাংশ/সারমর্ম ও রচনা-২:**

সারাংশ/সারমর্ম (গদ্য ও পদ্য), রচনা (ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, রাজনৈতিক বিষয়াবলি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক)

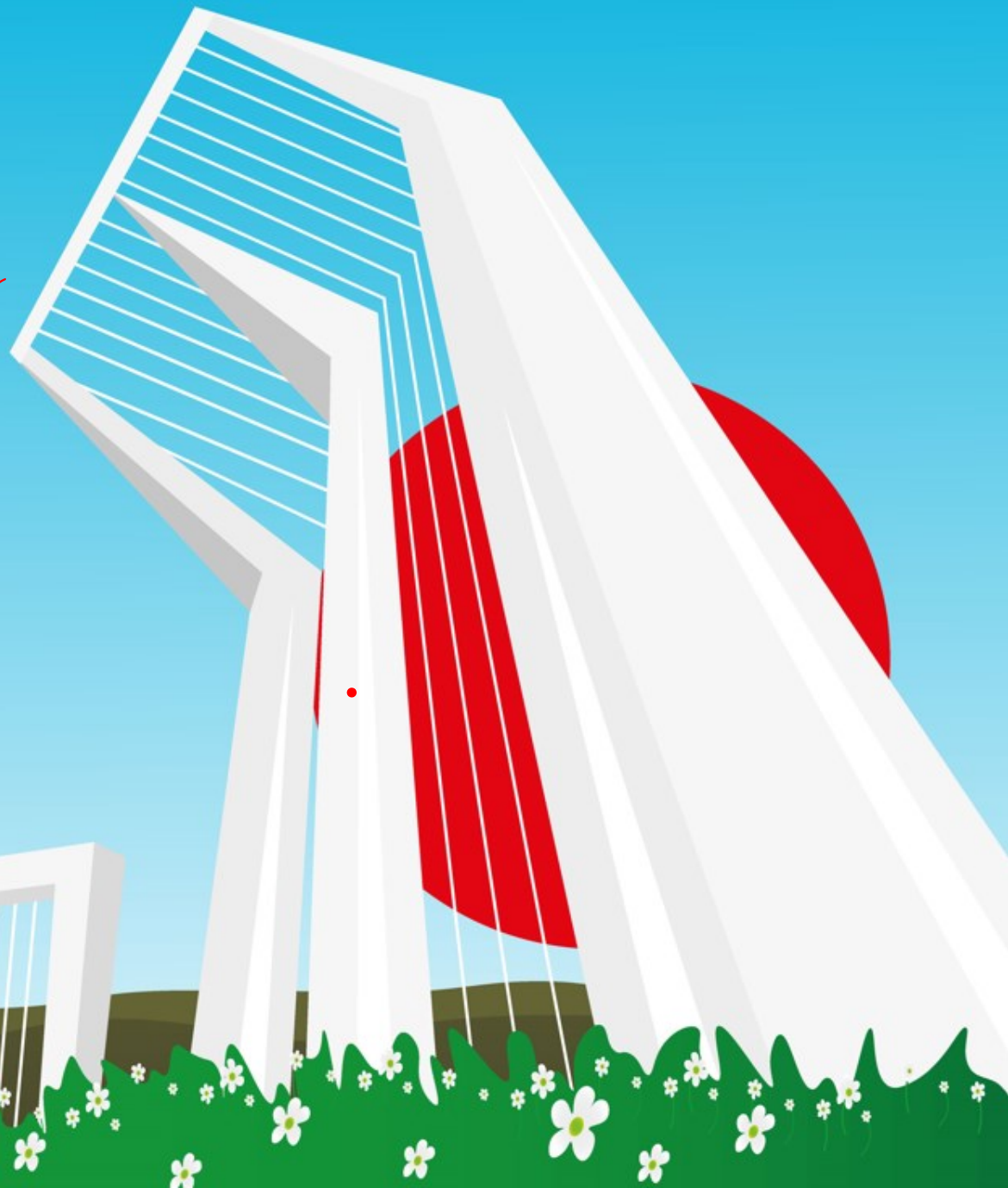

উত্তরণ ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি | 09666775566 | www.uttoron.academy

ভাব-সম্প্রসারণ

- **ভাব-সম্প্রসারণ:** শব্দটি বহু অর্থবাচক, অর্থাৎ একাধিক অর্থ বহন করে এবং এর ব্যবহারও বহুমাত্রিক। এখানে 'ভাব' শব্দটির অর্থ 'মর্ম' বা 'নিগূঢ় অর্থ'। আমরা জানি, সাহিত্যমাত্রই ভাবাশ্রয়ী। গদ্য কিংবা কাব্য যেকোনো রীতির সাহিত্যে সাহিত্যিকের 'অনুভূতির গাঢ়তা' (Emotion) লুকিয়ে থাকে। একে বলা হয় সাহিত্যের ভাব। তাহলে শাব্দিক অর্থে, ভাব-সম্প্রসারণ বলতে 'ভাব'-এর তথা 'অনুভূতির গাঢ়তা'-এর প্রসারণকেই বোঝায়। যে কোনো রীতির সাহিত্যের দু'একটি চরণে বা অংশে একটি 'ভাব' বা 'নিগূঢ় অর্থ' প্রচ্ছন্ন থাকে, যা মানবজীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যথাযথ যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সহজবোধ্য ভাষায় সেই গভীর 'ভাব'-এর প্রসারণকে ভাব-সম্প্রসারণ বলা হয়। সহজ কথায়, ভাব-সম্প্রসারণ হলো প্রাঞ্জল ভাষায় কোনো উদ্ধৃত সাহিত্যাংশের মূলভাবের বিস্তৃতি ঘটানো।

ভাব-সম্প্রসারণ

❑ ভাব-সম্প্রসারণের কিছু নিয়ম:

ভাব- সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যেমন –

- প্রথমে প্রদত্ত অংশটুকু ভালোভাবে পড়তে হবে। লেখকের রসঘন অর্থবহ রচনার মূল্যবান অংশ, কবিগণের ভাবগর্ভ ও উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি, প্রবাদ-বচন ইত্যাদি যেসব অংশ ভাব-সম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হয়, তার যথার্থ মর্ম বুঝতে পারলে ভাব-সম্প্রসারণ সহজ হয়ে যায়।
- ভাব-সম্প্রসারণকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে ভাবের অর্থ, দ্বিতীয় অংশে ভাবের ব্যাখ্যা এবং তৃতীয় অংশে ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন।
- অধিকাংশ বিষয়ের দুই ধরনের অর্থ থাকে। শাব্দিক অর্থ ও অন্তর্নিহিত অর্থ। তাই শাব্দিক অর্থকে ব্যাখ্যা করে অন্তর্নিহিত অর্থের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা উচিত। মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ-উপমা দেওয়া যেতে পারে। তবে উপমা অবশ্যই মূল বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
- আলোচ্য অংশ মানব জীবনের যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে।
- উদ্ধৃত অংশে ব্যবহৃত শব্দগুলো যে ভাবের অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছে, সেগুলোকে যথার্থভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে।

ভাব-সম্প্রসারণ

- ভাব-সম্প্রসারণ ব্যাখ্যা নয়। তাই ব্যাখ্যাংশের মতো রচনার নাম, রচয়িতার নাম, প্রসঙ্গ কথা ইত্যাদি উল্লেখ করা যাবে না। যেমন – কবি এখানে বলতে চেয়েছেন, লেখকের মতে..... ইত্যাদি লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- প্রদত্ত অংশটুকু প্রাসঙ্গিক হলে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, বা বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।
- অপ্রয়োজনীয় কথা ও কথার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সম্প্রসারিত ভাব লেখার আয়তন হবে বরাদ্দকৃত নম্বর অনুযায়ী।
- কোনটি বাড়তি তথ্য ও কোনটি আপনার অভিমত, পড়া মাত্র যেন এ দুইয়ের পার্থক্য বোঝা যায়। নচেৎ ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে।
- বক্তব্য যেন দৃঢ়বদ্ধ হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বাক্যের সাথে বাক্যের ও অনুচ্ছেদের সাথে অনুচ্ছেদের সম্পর্ক ঘটাতে হবে, সঙ্গতি রাখতে হবে। নাহলে বক্তব্যের স্বাভাবিক চলন ব্যাহত হবে। অর্থাৎ এমনভাবে লিখতে হবে যাতে ভাবের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিদ্যমান থাকে।
- একই অনুচ্ছেদে একই সাথে কর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্য ব্যবহার করা যাবে না। এতে রচনার গঠনগত সৌন্দর্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।
- সব সময় একই দৈর্ঘ্যের বাক্য ব্যবহার না করা। এতে একঘেয়েমি চলে আসে।
- সর্বোপরি সহজ-সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষার ব্যবহার করা।

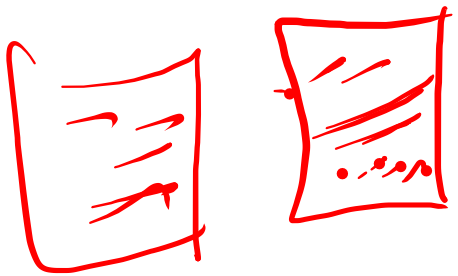

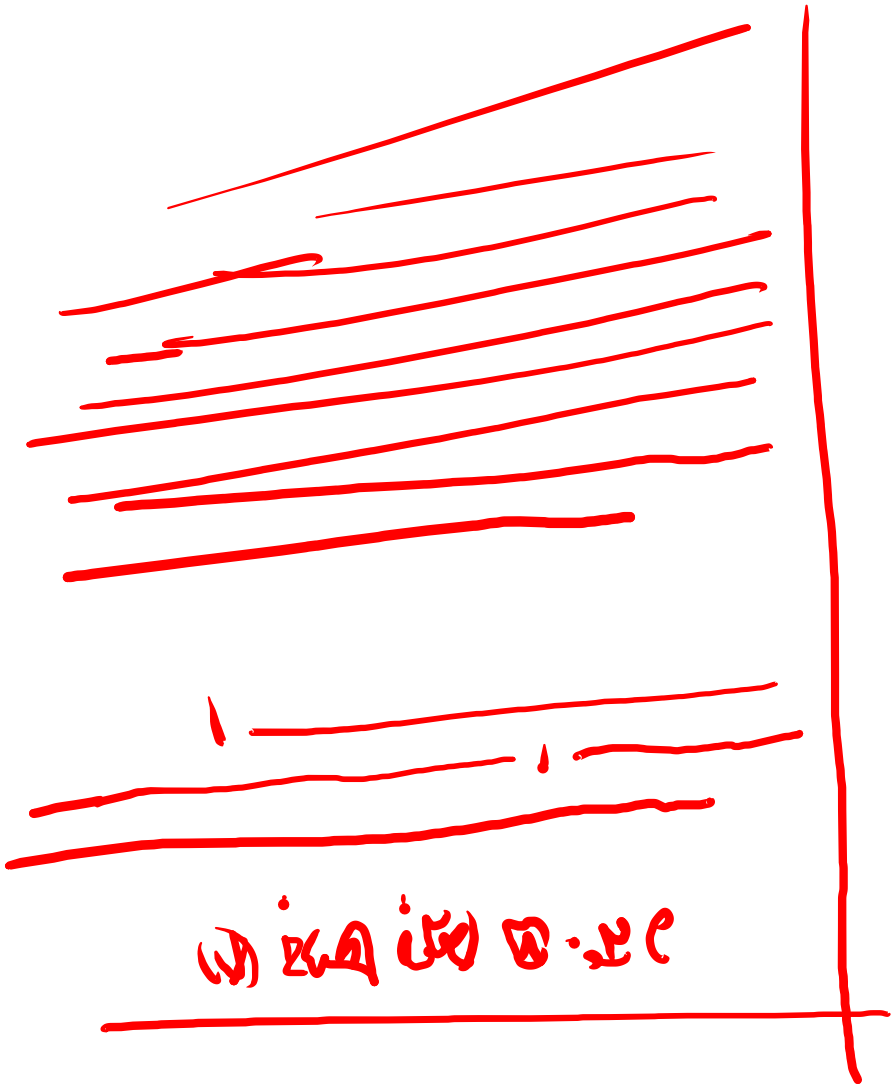

ভাব-সম্প্রসারণ

জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট
মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

[৪৫তম, ৩৭তম, ১৫তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ: জ্ঞান যদি উদারতাপূর্ণ না হয়, বুদ্ধি তাহলে সংকুচিত এবং অসাড় হতে বাধ্য। আর এমন পরিস্থিতিতে জ্ঞান ও চিন্তার মুক্তি সম্ভব নয়।

অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের প্রধান পার্থক্য কেবল চিন্তা ও বুদ্ধিতে। আদিকাল থেকে মানুষ তার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে নানা প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করে এসেছে। জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মানুষ বর্তমানে সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। নিজ বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। এতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হয়েছে সহজ। যে মানুষ জ্ঞানচর্চা করে না, সমাজের নানা সংস্কার, সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা এসে তাকে আঁকড়ে ধরে। তার জীবনে কোনো উন্নতিই হয় না। মানুষ হয়েও সে ভারবাহী জীব সদৃশ জীবনযাপন করে। জ্ঞানহীন মানুষের কোনো মূল্য নেই। জ্ঞানচর্চা না করলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হতে পারে না। ফলে সে ঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায় অনুধাবন করতে পারে না। এ রকম মানুষের দ্বারা যেকোনো অন্যায় কাজ করা স্বাভাবিক। একমাত্র জ্ঞানই মানুষকে প্রকৃত মুক্তি দিতে পারে। যে ব্যক্তি জ্ঞানতাপস সে তার বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। তার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। সে তার বুদ্ধি-বৃত্তির মাধ্যমে নিজের এবং আশপাশের মানুষের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব ব্যক্তিজীবনে যেমন প্রয়োজন, তেমনি জাতীয় জীবনেও অত্যাবশ্যকীয়। জ্ঞানচর্চা একটি দেশ ও জাতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সাহায্য করে। সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার মুছে দিয়ে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করে। মুক্তবুদ্ধি চর্চা একটি দেশ ও জাতিকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা দেয়। যে জাতির বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না, সে জাতি অন্ধকারে পড়ে থাকে। নানা অন্যায়, অবহেলা, কুসংস্কার তাদের ঘিরে ধরে। জ্ঞানহীন জাতির কোনো উন্নয়ন সম্ভব হয় না।

বিবেকের জাগরণের মাধ্যমে পার্থিব মহাকল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভূমিকা অপরিসীম। তাই অন্যায়-অবিচার, দুঃখ-দারিদ্র্য, কুসংস্কার-জড়তা থেকে মুক্তির জন্যে আমাদের জ্ঞানচর্চা করা উচিত।

ভাব-সম্প্রসারণ

জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো [৪৪, ৪১, ৩২তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ:

মানুষের জীবনের মূল্য ও মর্যাদা তার জন্ম আর বংশ পরিচয়ে নয়, বরং তার কর্মফল দিয়ে নির্ণয় করা হয়।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নিচু বংশে জন্মগ্রহণ করেও বহুলোক আপন কর্মের জন্য পৃথিবীর বুকে স্বনামধন্য হয়েছেন। আবার অনেকেই অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেও আপন দুষ্কর্মের ফলে সমাজের নিন্দা ও ঘৃণা কুড়িয়েছে। সুতরাং কর্তব্য পরায়ন কর্মময় জীবনের অধিকারী ব্যক্তিরাই হলেন প্রকৃত আশরাফ বা অভিজাত। এসব ব্যক্তি বিধাতার আশীর্বাদে পৃথিবীতে অনেক সুকঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। ভালো কাজের মাধ্যমে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পক্ষান্তরে, যারা কোনো দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে না, তাদেরকে কেউ মনে রাখে না। হতে পারে তার জন্ম উঁচু ও অভিজাত বংশে কিন্তু কর্মের বিবেচনায় সে কালের প্রবাহে হারিয়ে যায়। এসব ব্যক্তিকে কেউ মনে রাখে না বা রাখার প্রয়োজনও মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে, কর্মহীন মানুষ যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার কোনো মূল্য বা মর্যাদা নেই। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা তার কর্মে, বংশে নয়। বর্তমান যুগে মানুষের ধ্যানধারণা ও চেতনার আমূল পরিবর্তন হয়েছে, ধর্মীয় বিধির ওপর ভিত্তি করে আশরাফ-আতরাফ নির্বাচনে এখন মানুষ তেমন গুরুত্ব দেয় না। মানুষের কর্মই নির্ধারণ করে সে আশরাফ নাকি আতরাফ।

আমরা বলতে পারি, সর্বজনীন পূণ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী ব্যক্তিরাই হলেন প্রকৃত আশরাফ বা অভিজাত। সুকর্মই মানুষের মর্যাদা, মানুষের আভিজাত্য।

ভাব-সম্প্রসারণ

এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই । [৪৪তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ: মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সকল উপাসনালয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপাসনালয় হল মানুষের হৃদয়। কারণ পবিত্র হৃদয় থেকেই স্রষ্টাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়।

মানুষ তার মন, হৃদয়, সৃষ্টি ও সৃজনশীলতার কারণে অন্যান্য প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ। আর এ মানুষই পারে স্রষ্টাকে সবচেয়ে ভালোভাবে ধারণ করতে। বুদ্ধি-বিবেচনা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় মানুষের সমকক্ষ আর কোনো প্রাণী নেই। মানুষের রয়েছে বিচার ও বিশ্লেষণের শক্তি। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য বিচার করে চলা মানুষের ধর্ম। পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য নির্ধারণে মানুষকে পরিচালিত করে মানুষের মন। মন দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সৎ কাজ করে এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করে। স্রষ্টা অন্তর্যামী। মানুষের হৃদয়ের খবরাখবর তিনি রাখেন। তাই তাঁকে পেতে হলে হৃদয়কে শুদ্ধ করতে হবে। যাঁরা নির্মল হৃদয়ের অধিকারী তাঁরাই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। মিথ্যা, কপটতা এবং হীনমন্যতায় যাদের হৃদয় পরিপূর্ণ তাদের মসজিদে মন্দিরে গিয়ে লাভ নেই। তারা যতই সেজদা অথবা পূজা-অর্চনা করুক না কেন, তাতে কোনো কাজ হবে না। কেউ কেউ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মসজিদে-মন্দিরে গিয়ে আরাধনা করে। কিন্তু তার হৃদয় যদি কলুষমুক্ত না হয়, তাহলে রাতভর আরাধনা করেও কোনো লাভ হবে না। এক হাজারটি কাবা শরীফ কিংবা মন্দির সমান একটি অন্তর। অর্থাৎ অন্তর শুদ্ধ না করে কাবা শরীফে বা মন্দিরে গিয়ে কোনো লাভ নেই। পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী যাঁরা তাদেরকে কাবা শরীফ বা মন্দিরে যেতে হয় না- তাঁরা সহজেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করেন। কাবা বা মন্দিরের চেয়ে হৃদয়ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। নির্মল হৃদয়ের অধিকারী যাঁরা তাঁরাই সৃষ্টি কর্তাকে কাছে পেয়ে থাকেন।

কাবা বা মন্দির নয় মানুষের হৃদয় হচ্ছে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ অবস্থান। পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী যাঁরা তাঁরাই সৃষ্টি কর্তাকে কাছ থেকে অনুধাবন করতে পারেন। তাই স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য মসজিদ বা মন্দিরে না গিয়ে নিজের হৃদয়কে পবিত্র করতে হবে।

ভাব-সম্প্রসারণ

ভোগে সুখ নাই, কর্মেই প্রকৃত সুখ। [৪৩তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ:

মহৎ কর্মের মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা নিহিত। ভোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় ব্যক্তির লোভ-লালসা। সৎ ও সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমেই মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ ও বিকাশ ঘটে। ~~তাই ভোগে নয়, কর্মের মধ্যেই মানব জীবনে সার্থকতা নিহিত।~~

জগৎসংসারে ভোগ ও কর্ম দুটি বিপরীতমুখী দিক। ভোগ ও কর্ম সম্পাদনের দরজা সবার জন্যই উন্মুক্ত থাকে। মানুষ ভোগে আনন্দ পেলেও তৃপ্তি পায় না। কিন্তু সন্তোষজনক কর্মে আনন্দ ও তৃপ্তি দুটোই লাভ করা যায়। তাই ভোগে নয়, কর্মই জীবনের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনুষ্যত্বের কল্যাণেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা ও শ্রেষ্ঠ। ভোগের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না। ভোগ মানুষকে জড়িয়ে ফেলে পঙ্কিলতা, গ্লানি ও কালিমার সঙ্গে। ভোগবাদীদের অর্জিত সম্পদ নিজের স্বার্থ ব্যতীত সমাজের অন্য কোনো কাজে আসে না। তাই, পরের দুঃখে তাদের হৃদয় মনও কাঁদে না। পরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার আদর্শ ও উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের মধ্যেই নিহিত থাকে। মনুষ্যত্বের গুণে মানুষ নিজের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে পরার্থে, দীন-দুঃখীদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়।

স্বামী বিবেকানন্দ, মাদার তেরেসা, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ ব্যক্তির চরিত্র সৎকর্মের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ভোগ ও সুখ নিয়ে মানুষের নানারকম ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। সুখের জন্য অনেকেই বিলাসিতায় মত্ত হয়ে ওঠে এবং ভোগ বিলাসের নানা উপকরণের আয়োজন করে। কিন্তু কোনোভাবেই ভোগাকীর্ণ জীবন সুখের সন্ধান দেয় না। কেননা ভোগই যদি সুখের আকর হতো, তবে বিত্ত ও ক্ষমতাবানরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী বলে গণ্য হতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এঁরাও জীবনে প্রকৃত সুখী হতে পারেন না। একমাত্র মহৎ কর্মের মধ্য দিয়েই সুখ পাওয়া যায়। দেশব্রতী, মানবব্রতী কর্মেই মানুষ লাভ করে জীবনের সার্থকতা।

জীবনের পরম শান্তি 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে'র মধ্যে নিহিত। যথার্থ সুখ পরিভোগ প্রবণতার মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় নিরন্তর কাজের মধ্যে এবং দেশব্রতী ও মানবব্রতী ভূমিকার মধ্যে।

ভাব-সম্প্রসারণ

কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে,
আর তা থেকে যে আলো ঠিকরে বেরোয়,
তার নাম কালচার।

[৪০তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ: বিদ্যা মানবমনের সকল প্রকার কুসংস্কার, জড়তা ও হীনতা দূর করে; জীবনকে করে আলোকিত ও উদ্ভাসিত। আর অন্তরের সুপ্ত আলো বিকাশের মাধ্যমে যে শিক্ষার প্রকাশ তাই সংস্কৃতি।

বিদ্যা মানুষের অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদের বলেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। বিদ্যার্জনের মাধ্যমেই মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ ইত্যাদি বিচারবোধের অধিকারী হতে পারে। বিদ্যা কুসংস্কার দূর করে মানুষের মনকে কলুষতামুক্ত করে তোলে। মানুষের অন্তর্নিহিত পাশবিক শক্তির বিনাশ সাধন করে পূত-পবিত্র জীবন গঠনে সহায়তা করে। বিদ্যার এ মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়, বিদ্বান ব্যক্তির আচার-আচরণ তথা কালচারে। নিজের জীবনকে ভালোভাবে পরিচালিত করতে, সুন্দর করতে, মহান করতে মানুষ কালচারের চর্চা করে। আর প্রকৃত বিদ্যার্জনের মাধ্যমেই মানুষ সংস্কৃতিবান হতে পারে। বিদ্যা মানুষের মধ্যে যে আচরণগত পরিবর্তন আনে তাই কালচার। হীরার পাথর আর তা থেকে বিচ্যুত আলোর যে সম্পর্ক, বিদ্যা ও কালচারের মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। হীরা মূল্যবান পাথর। তা থেকে বিচ্যুত আলোক রশ্মির জন্যেই হীরার কদর এত বেশি। হীরা থেকে বিচ্যুত আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকের অন্ধকার দূর করে। বিদ্যাও হীরার অনুরূপ। বিদ্যার হিরন্ময় আলোক স্পর্শে মানব মনের সকল প্রকার কলুষ-কালিমা দূরীভূত হয়। বিদ্যা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে, তাকে মানবকল্যাণে অবদান রাখতে উৎসাহিত করে। আর সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটায়। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি সমাজের অন্য দশজনের মতো অন্ধভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করে না। তার জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যুক্তি-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর একমাত্র যথার্থ বিদ্যাচর্চার মাধ্যমেই সংস্কৃতিবান ব্যক্তির মনের এই যুক্তিবুদ্ধি ও বিজ্ঞানমনস্কতার উদ্ভব ঘটে। স্বীয় কর্মগুণে যারা জগতে মহার্ঘ লাভ করেছেন, তারা সবাই ছিলেন যথার্থ বিদ্যা চর্চাকারী। বাস্তব জগতেও দেখা যায়, যে জাতি বিদ্যা-শিক্ষা-জ্ঞানচর্চায় যত বেশি পারদর্শী, সে জাতি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে তত বেশি অগ্রগামী।

সুতরাং মানবজীবনের যথার্থ বিকাশের জন্য এবং সুষ্ঠু সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে যথার্থ বিদ্যা চর্চা করতে হবে। তবেই সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে বিশ্ব মাঝারে বাঙালি জাতি স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবে।

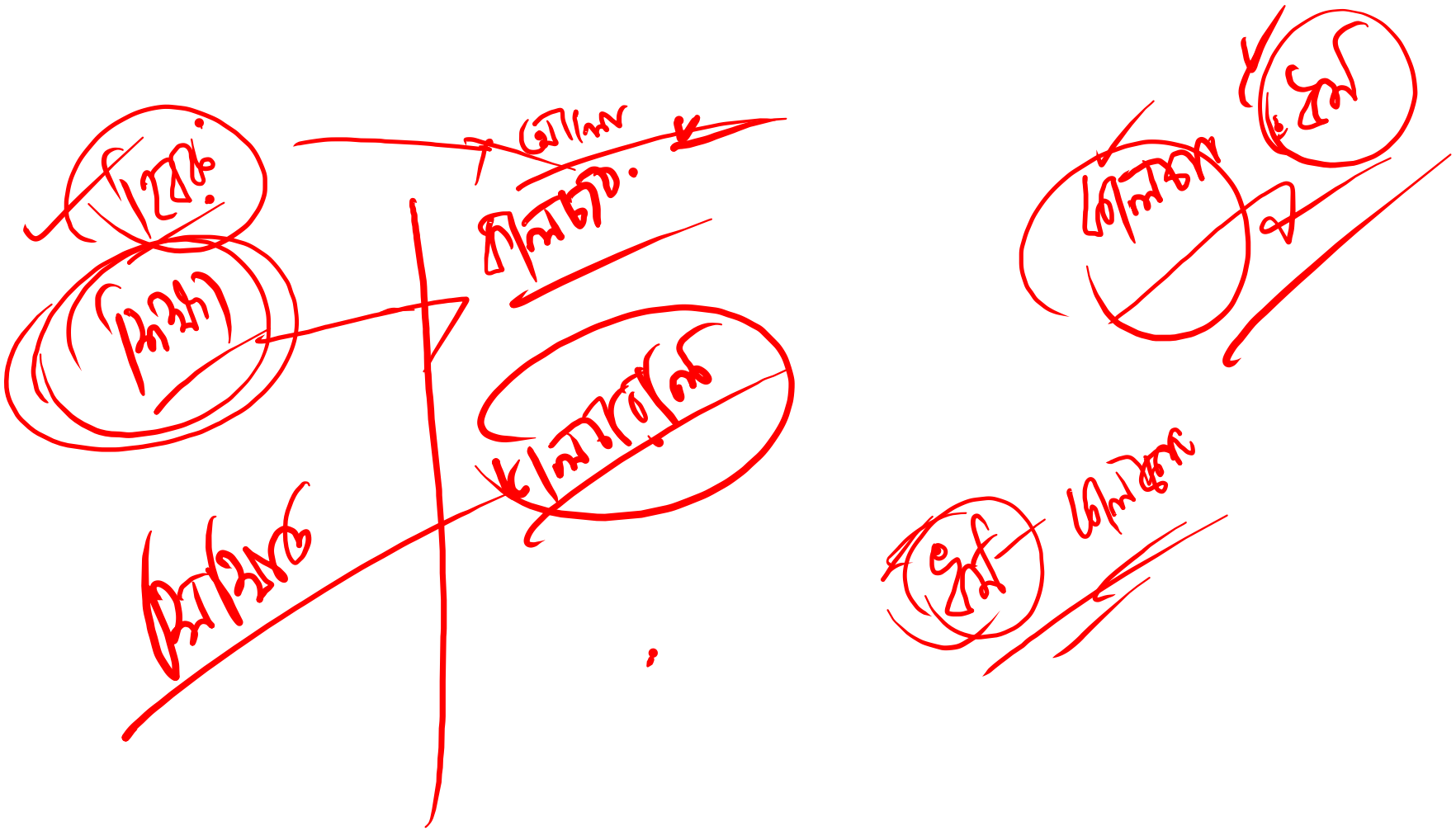

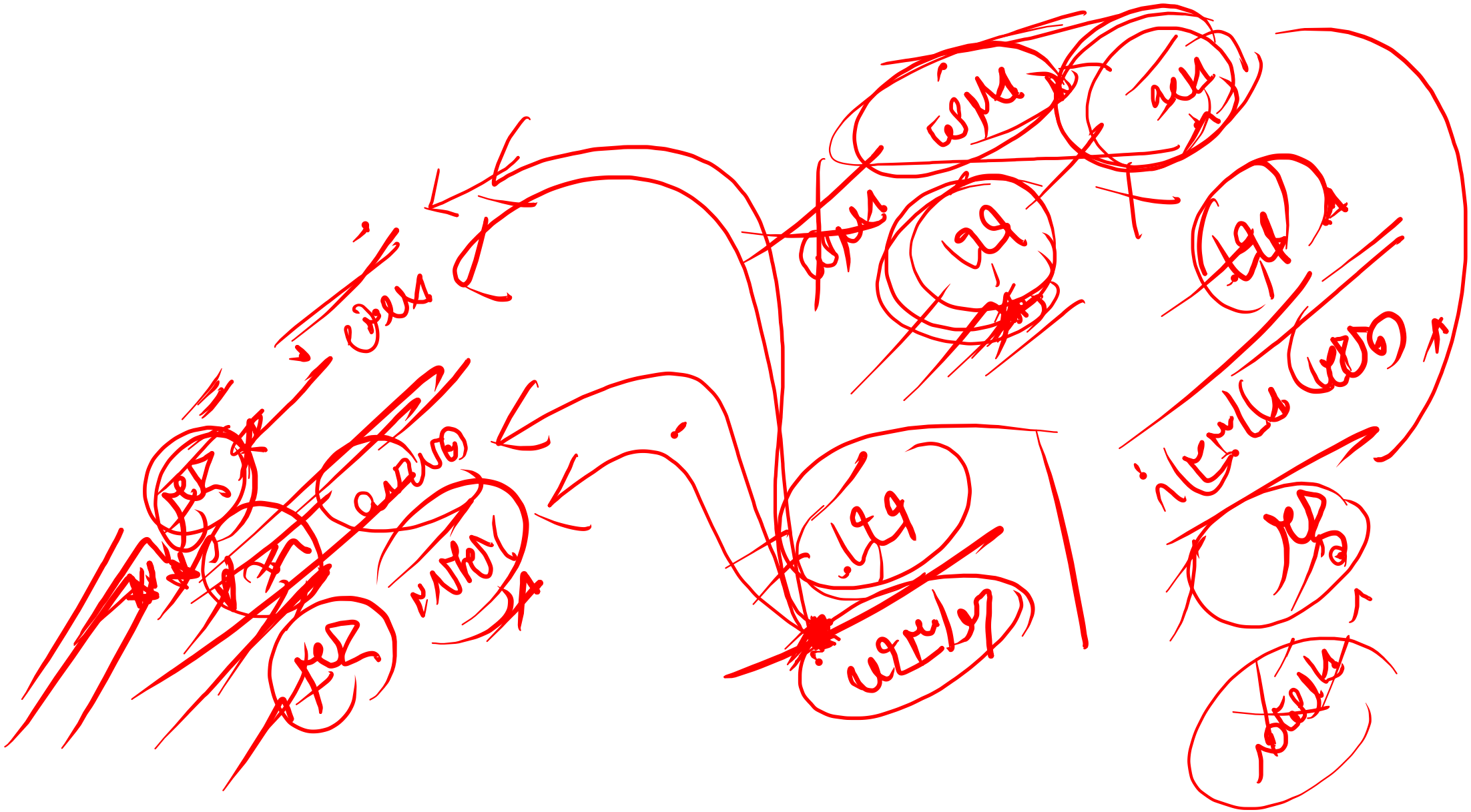

ভাব-সম্প্রসারণ

অসি অপেক্ষা মসি অধিকতর শক্তিমান।

ভাব-সম্প্রসারণ: একবিংশ শতাব্দীতে মানবসম্প্রদায় আজ তার জ্ঞান প্রকাশের মাধ্যমেই জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে ক্ষমতাকে ব্যাপৃত করেছে। এই মহাসন্ধিক্ষণে এখন আর কেউ অসি অর্থাৎ তরবারি চালানোর মাধ্যমে নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তাকে আশ্রয় নিতে হয় মসি অর্থাৎ কালি বা কলমের।

অসি অর্থাৎ তরবারির তীক্ষ্ণ ধারের কাছে অনেক কিছুই তুচ্ছ। তাই আক্ষরিক অর্থে অসিকেই সবচেয়ে শক্তিশালী জ্ঞান করবার কথা। কিন্তু কালের বিবর্তনে মসি অর্থাৎ কলমের কালির মাধ্যমে মানবমনের প্রকাশিত চিন্তন শক্তি এবং তার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ত্রিকালদর্শী জ্ঞান করেছে। পৃথিবীর সূচনাকাল হতে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে। প্রারম্ভিক অবস্থায় মানুষ তার দৈহিক শক্তিকে পুঁজি করে প্রকৃতির সাথে নিয়ত সংগ্রাম করেছে। ক্রমে মানুষ পশুশক্তিকে জয় করার জন্য হাতিয়ারের আবিষ্কার ও ব্যবহার শিখেছে। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসের একটি পর্যায়ে এসে মানুষের ব্যক্তিমালিকানার বলয় রেখা বৃদ্ধি করার জন্য শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, অসি বা তরবারির বিক্রমে পররাজ্য গ্রাস, রাজ্য জয়, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য অসির নিচে পদানত। অসির নিচেই শাসিত হয়েছে অসংখ্য মানুষেরা। এতদসত্ত্বেও দৃশ্যমান বিবেচনায় অসির ক্ষমতা অধিকতর শক্তিমান রূপে দৃষ্ট হলেও ক্রমে মানুষ অসির ভয় উপেক্ষা করেই ভূলোকের মোড়ে মোড়ে সভ্যতা গড়েছে। জ্ঞানহীনতা ও মূর্খতা বিশিষ্ট শক্তির ব্যবহারে এখন আর রাজ্য চালনা কিংবা রাজ্য জয় সম্ভব নয়। অসির দেহে এখন মরিচার প্রলেপ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে কলমের খোঁচায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা পাল্টে দিয়েছে। এখন আর কেহ অসির ভয়ে ভীত নয়। মসির দেহে ভর করে মানুষ জয় করে চলেছে পৃথিবীর এক গোলার্ধ থেকে আরেক গোলার্ধ। যে জাতির মসির গতি যত ক্ষিপ্রমাণ, তার উন্নতির চাকাও ততোধিক দ্রুত ঘূর্ণায়মান।

তাই একবিংশ শতাব্দীর এ পর্যায়ে এসে মানুষ তার বোধের দরজায় কড়া নেড়ে টের পায় অসির শক্তির বৃদ্ধির চেয়ে মসির শক্তি বৃদ্ধিই অধিকতর কল্যাণকর।

রচনা/প্রবন্ধ

'রচনা' শব্দের অর্থ কোনো কিছু নির্মাণ বা সৃষ্টি করা। কোনো বিশেষ ভাব বা তত্ত্বকে ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তোলার নামই রচনা। রচনাকে সাধারণত সৃষ্টিশীল কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে বিষয়ের উপস্থাপনা, চিন্তার ধারাবাহিকতা, সংযত বর্ণনা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও যুক্তির সুশৃঙ্খল প্রয়োগ থাকে।

'প্রবন্ধ' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' বলতে বিষয়বস্তু ও চিন্তার ধারাবাহিক বন্ধনকে বোঝায়। নাতিদীর্ঘ, সুবিন্যস্ত গদ্য রচনাকে প্রবন্ধ বলে। প্রবন্ধ রচনার বিষয়, ভাব, ভাষা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত সাহিত্যের বিচারে রচনা ও প্রবন্ধের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাধারণ বিচারে প্রবন্ধ ও রচনাকে সমধর্মী বলে মনে করা হয়।

❑ **রচনার বিভিন্ন অংশ:** রচনার প্রধান অংশ তিনটি – ক. ভূমিকা, খ. বিষয়বস্তু, গ. উপসংহার।

➢ **ভূমিকা:** এটি রচনার প্রবেশপথ। একে সূচনা, প্রারম্ভিকা বা প্রাক-কথনও বলা চলে। এতে যে বিষয়ে রচনা হবে, তার আভাস এবং সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হওয়াই উচিত।

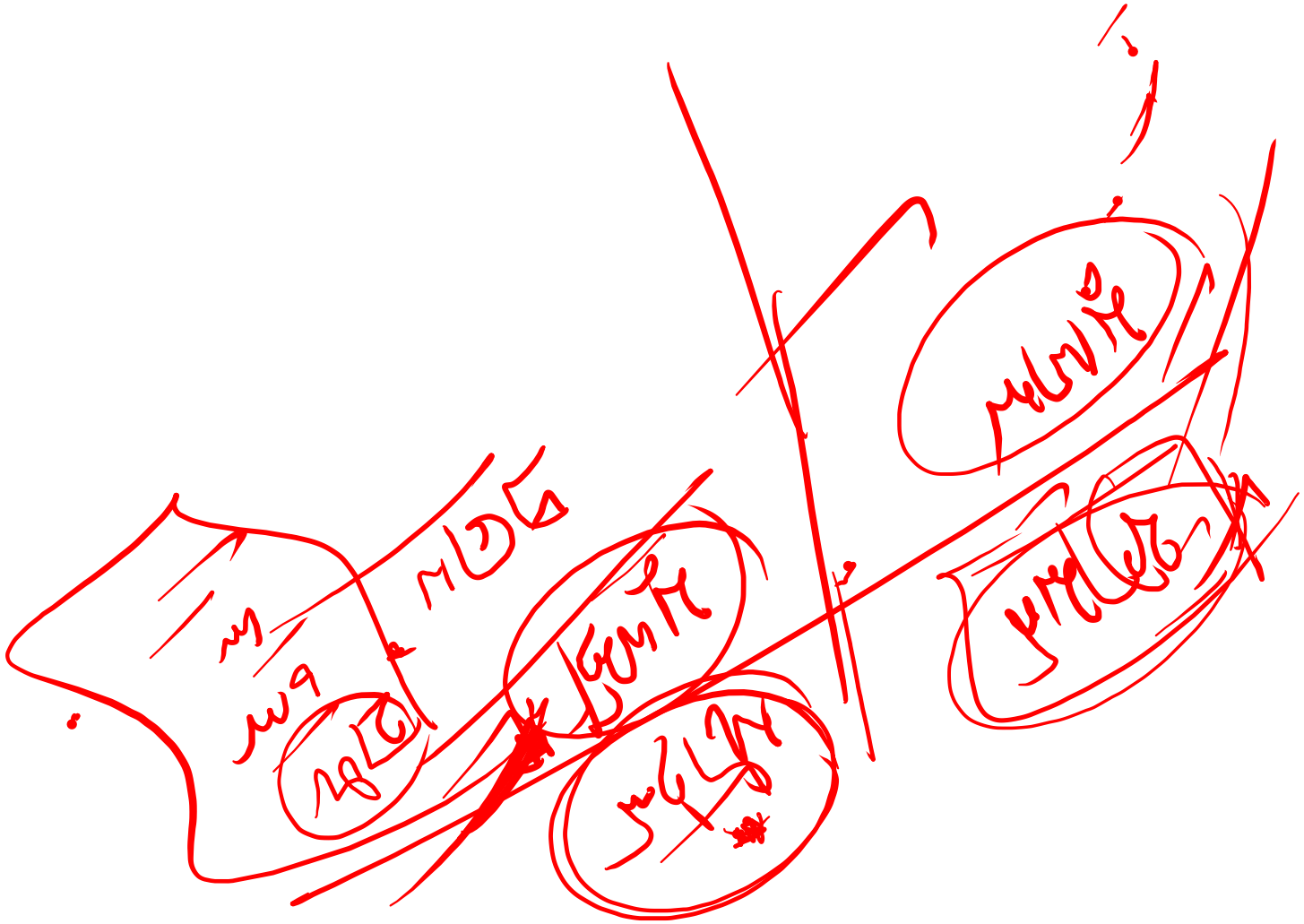

- **বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্য:** বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্যই হচ্ছে রচনার প্রধান অংশ। এ অংশে রচনার মূল বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পরিচয় স্পষ্ট করতে হয়। বিষয় বা ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োজনে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা যেতে পারে। বেশি বেশি পয়েন্ট দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, অনুচ্ছেদগুলোর ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য এ অংশে প্রয়োজনে উদাহরণ, উপমা, উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।
- **উপসংহার:** বিষয়বস্তু আলোচনার পর এ অংশে একটা সিদ্ধান্তে আসা হয় বলে এটাকে 'উপসংহার' নামে অভিহিত করা হয়। এখানে বর্ণিত বিষয়ে লেখকের নিজস্ব মতামত বা অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়।

❑ **রচনার শ্রেণিবিভাগ:** বিষয়বস্তু অনুসারে রচনাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় –

✓ বর্ণনামূলক রচনা, ✓ চিন্তামূলক রচনা।

- **বর্ণনামূলক রচনা:** বর্ণনামূলক রচনা সাধারণত স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তিগত স্মৃতি-অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে থাকে। ধান, পাট, শরৎকাল, কাগজ, টেলিভিশন, বনভোজন, শৈশবস্মৃতি ইত্যাদি রচনা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।
- **চিন্তামূলক রচনা:** চিন্তামূলক রচনায় থাকে সাধারণত তত্ত্ব, তথ্য, ধ্যান-ধারণা, চেতনা ইত্যাদি। শ্রমের মর্যাদা, নারী নির্যাতন ও তার প্রতিকার, পরিবেশ দূষণ, অধ্যবসায়, সত্যবাদিতা, চরিত্রগঠন প্রভৃতি এই শ্রেণির রচনার মধ্যে পড়ে।

রচনা/প্রবন্ধ

❑ প্রবন্ধ-রচনার কৌশল:

০১. বর্ণনার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি, রং, ধ্বনি, স্বাদ, গন্ধ, অনুভূতি ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলতে হবে।

০২. বর্ণনামূলক রচনা লেখার সময় সময়সীমা এবং পরিসরের কথা মনে রেখে বিশেষ কিছু দিক বেছে নিতে হয়। সেগুলোর সাহায্যে মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয়।

০৩. রচনা লেখার সময় পরম্পরা বা ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। চিন্তাগুলো যেন এলোমেলো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। জানা বিষয় ছাড়াও অনেক সময় অজানা বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে হতে পারে। বিষয়ের ধারণাগুলো একটির পর একটি এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে ভাবের কোনো অসংগতি না থাকে।

০৪. প্রবন্ধ বা রচনার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সম্যক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সাধারণত রচনার দৈর্ঘ্য অনধিক ১৫০০-১৮০০ শব্দের মধ্যে হলে ভালো হয়। তবে পরীক্ষার কক্ষে কিংবা বিশেষ পরিবেশে বসে রচনা লেখার সময় শব্দ গুণে গুণে লেখা যায় না। এগুলো পূর্ব থেকে অভ্যাস করা ভালো। যেমন, প্রতি লাইনে সাধারণভাবে কত শব্দ থাকে; সেই হিসেবে ১৫০০-১৮০০ শব্দ দিতে গেলে কত লাইন বা কত পাতা লেখা যায়, তা অনুশীলনের সময় হিসাব করে রাখা ভালো।

০৫. প্রবন্ধের ভাষা সহজ এবং প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়। সন্ধিজাত শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, অপরিচিত বা অপ্রচলিত শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করা ভালো। বাগাড়ম্বর বা অলংকারবহুল শব্দ ব্যবহার করা হলে অনেক সময় বিষয়টি জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষারীতির মাধ্যমে রচনাকে যথাসম্ভব রসমণ্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করতে হয়।

০৬. প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা এবং উপসংহার কথাটি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। শুধু প্যারা দিয়ে লিখলেই হবে তবে অন্যান্য প্যারাগুলোতে অবশ্যই হেডিং দিতে হবে।

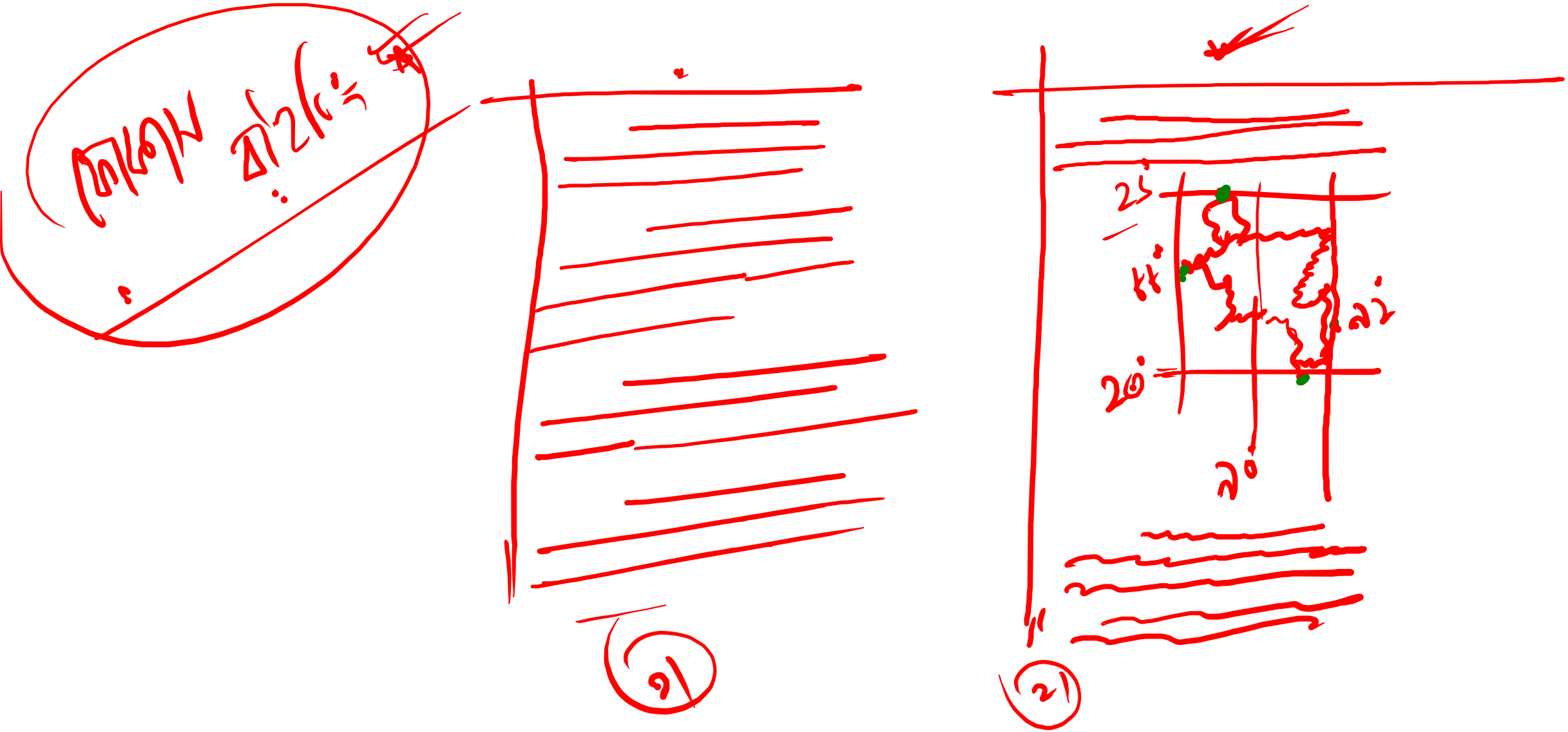
23
19
20
15
1
2

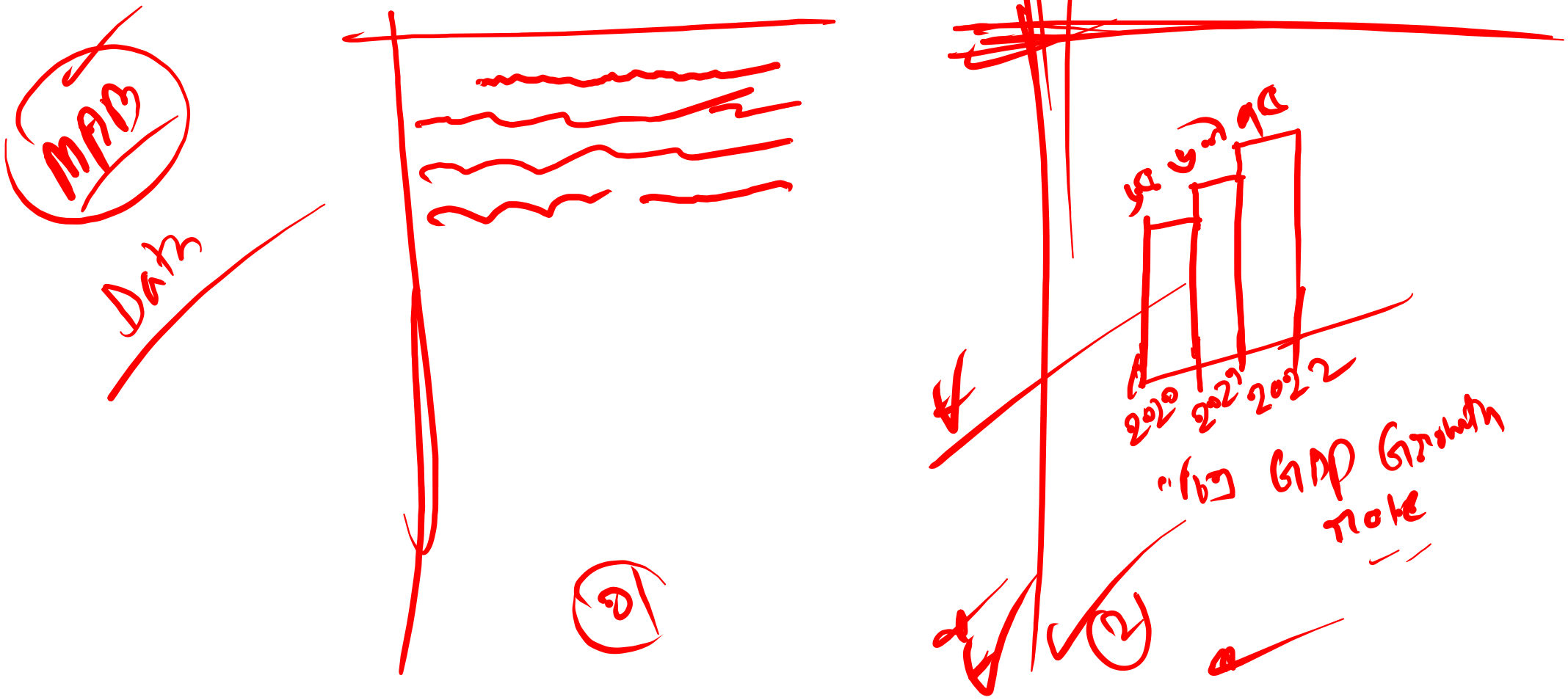

MAP
Data
2020
2021
2022
GDP Growth rate

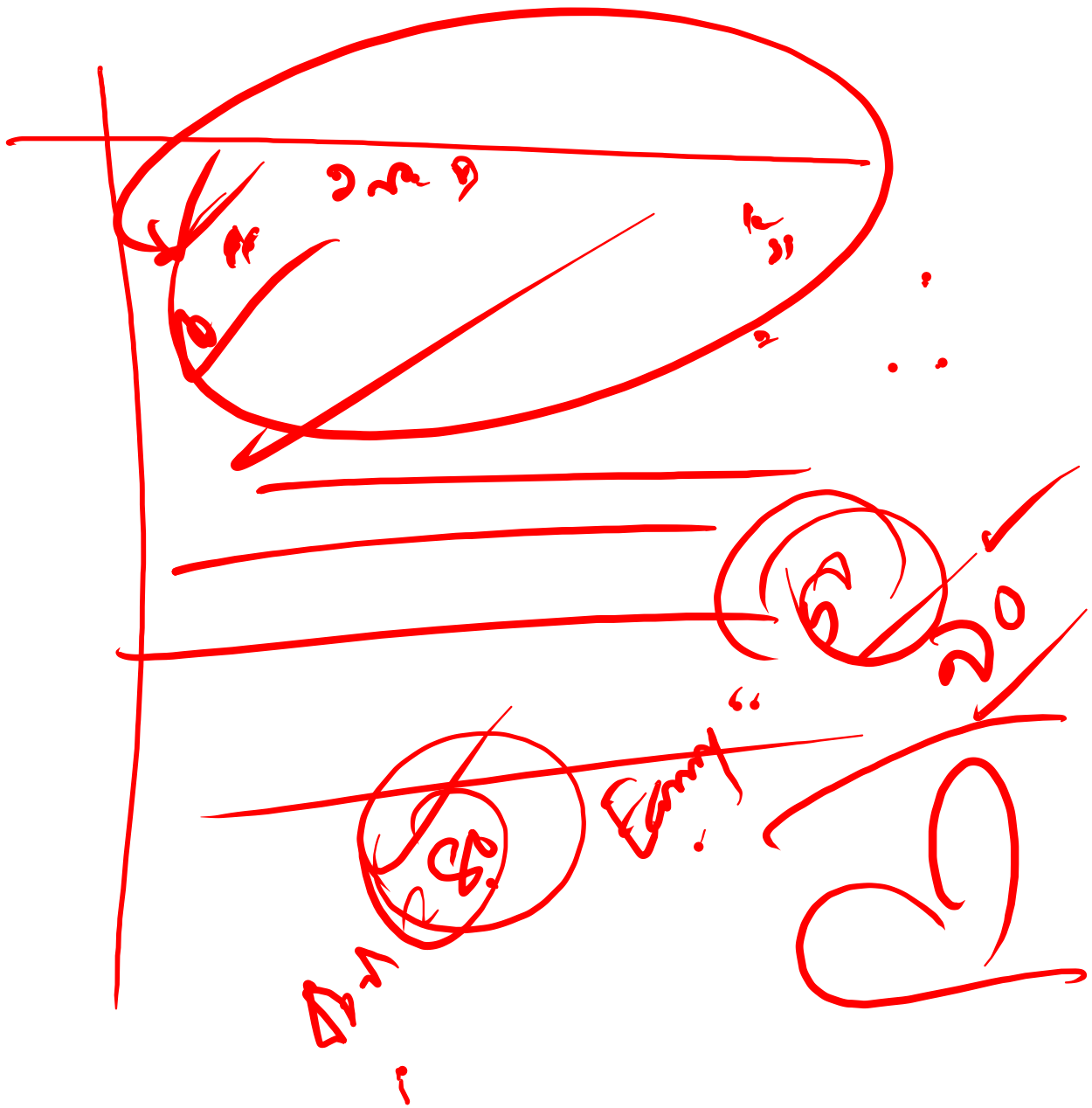

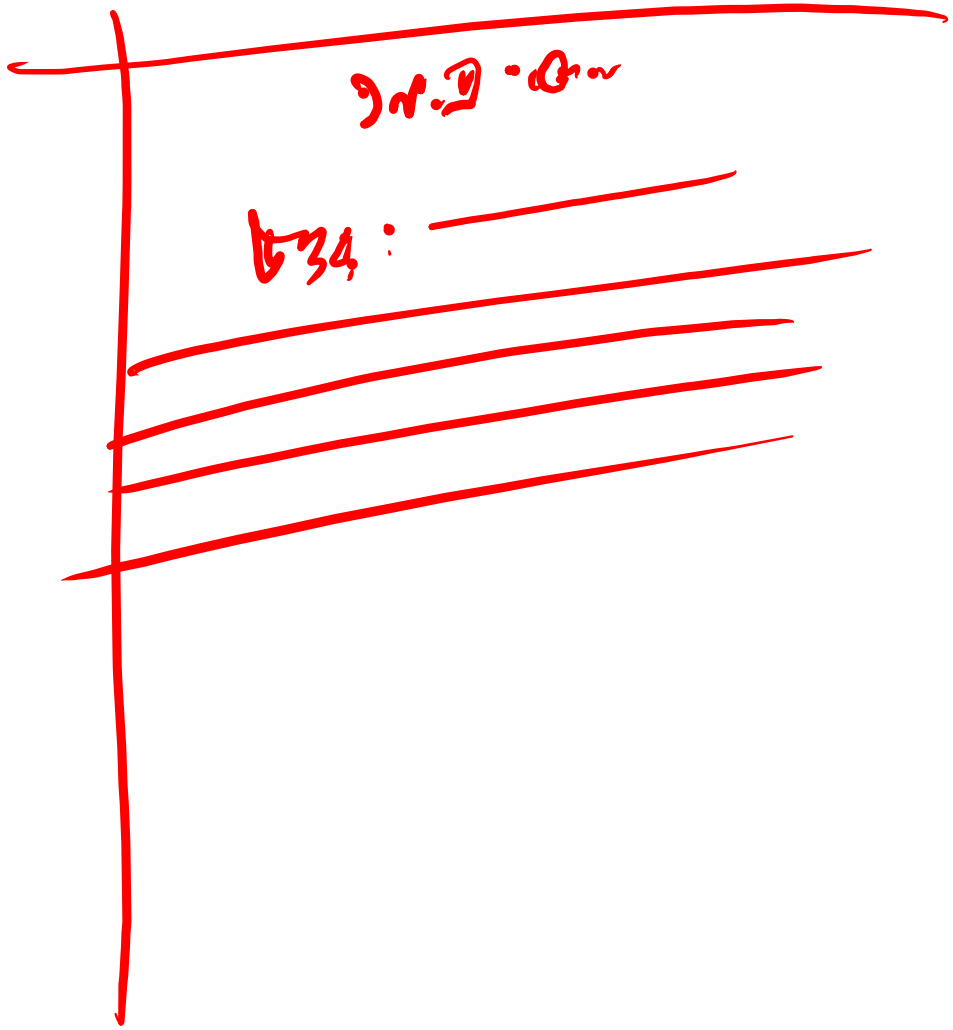

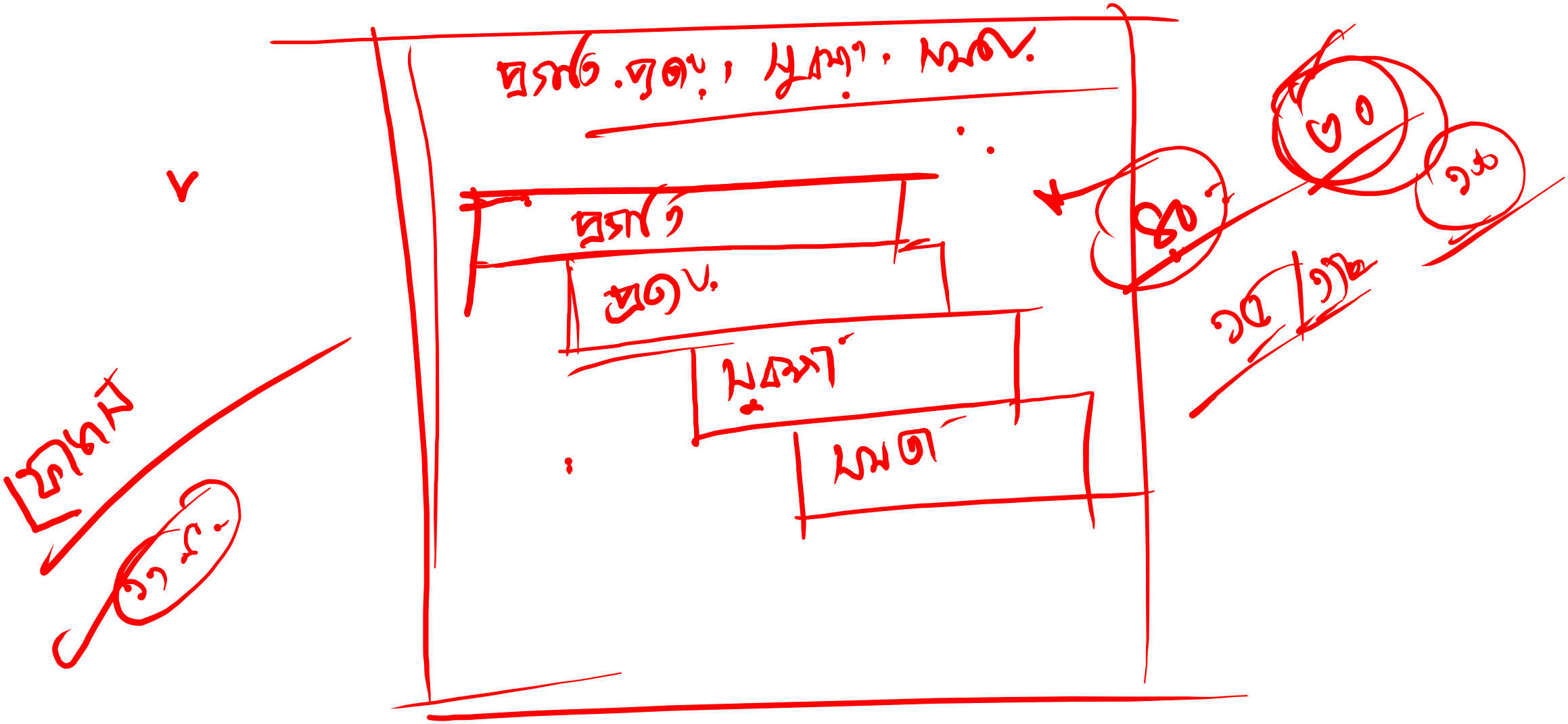

রচনা/প্রবন্ধ

❑ প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতা অর্জনের উপায়:

প্রবন্ধ রচনায় রাতারাতি দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এর জন্য নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিকগুলো সহায়ক হতে পারে–

০১. প্রবন্ধ লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচুর প্রবন্ধ বা রচনা পড়তে হবে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, সংবাদ, প্রতিবেদন, ফিচার ইত্যাদি নিয়মিত পাঠ করলে নানা বিষয়ের ধারণা জন্মায় এবং শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। এতে লেখা সহজ হয়ে ওঠে।

০২. প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, যুক্তি, তথ্য, তত্ত্ব, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ানুগ, প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার।

০৩. ভাষারীতিতে সাধু এবং চলিত যেন মিশে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অযথা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য, উদ্ধৃতি ব্যবহার করা উচিত নয়।

০৪. প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত ছাড়াও নিজের বক্তব্যকে আরো জোরালো করার জন্য প্রবাদ- প্রবচন, কবিতার পঙক্তি উদ্ধৃতি ইত্যাদি সন্নিবেশ করা চলে।

০৫. নিজের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, চিন্তাশক্তি, পঠন- পাঠন, ভাষাগত দক্ষতা ও উপস্থাপন কৌশল ইত্যাদি প্রয়োগ করে প্রবন্ধকে যথাসম্ভব হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করা উচিত।

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় আসা রচনাসমূহ

❖ **প্রবন্ধ রচনা করুন:** [৪৫তম বিসিএস]

ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা।

❖ যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৪৪তম বিসিএস]

(ক) মুক্তিযুদ্ধ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) বাংলাদেশের কৃষির যান্ত্রিকীকরণ
(গ) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার
(ঘ) রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বিশ্বপরিস্থিতি
(ঙ) পদ্মা সেতু: বাঙালির গর্ব, বাঙালির অহংকার

❖ যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৪৩তম বিসিএস]

(ক) আমার ছেলেবেলা
(খ) আত্মশক্তি
(গ) দক্ষিণবঙ্গের উন্নয়ন স্বপ্ন
(ঘ) বাংলাদেশের পুরাকীর্তি
(ঙ) কক্সবাজার

❖ যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন: [৪১তম বিসিএস]

(ক) মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পর্যটনস্থান
(গ) সংক্রামক রোগ ও জনসচেতনতা
(ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ
(ঙ) বৃদ্ধাশ্রম

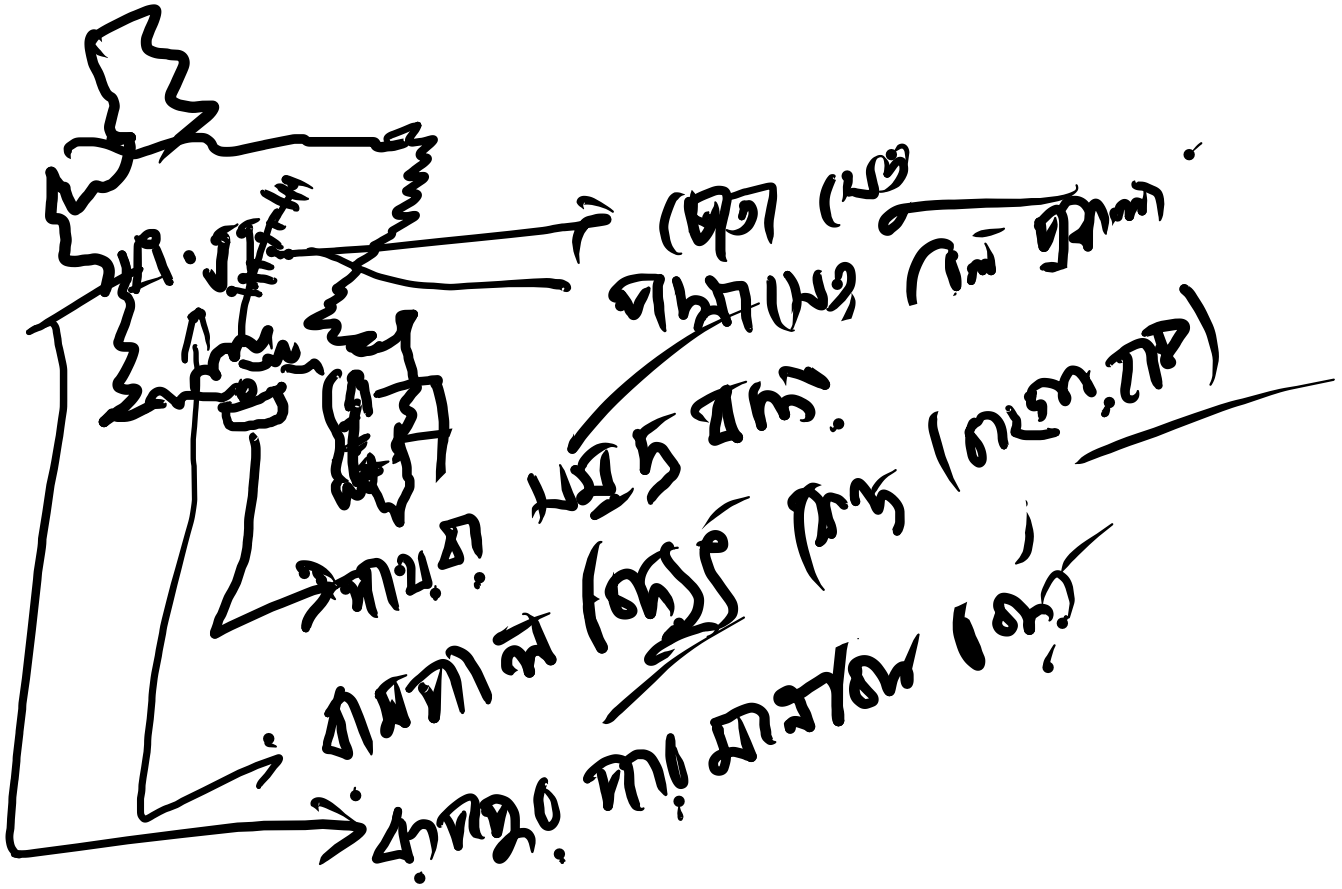

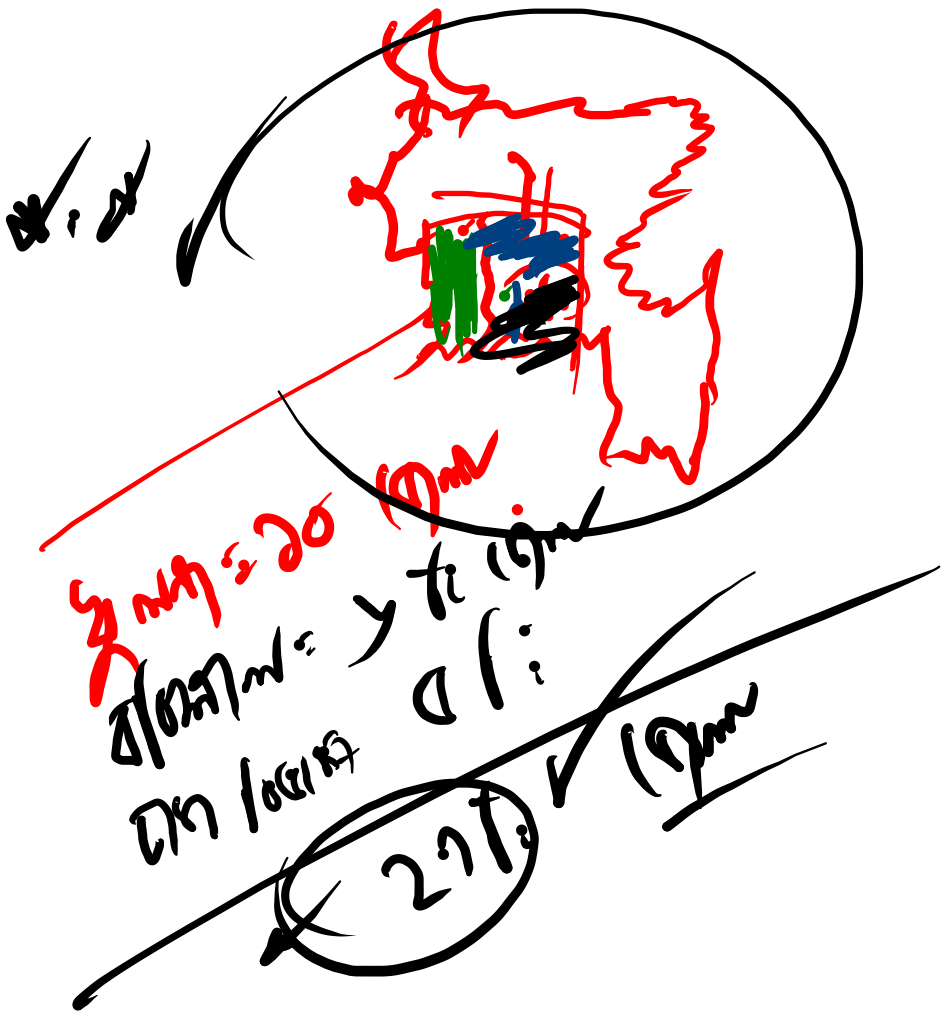

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় আসা রচনাসমূহ

❖ যে কোনো একটি বিষয় প্রবন্ধ রচনা করুন: [৪০তম বিসিএস]

(ক) উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ
(খ) একজন মহীয়সী নারী
(গ) বাংলাদেশের পোশাক শিল্প
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার
(ঙ) বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি

❖ যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৩৮তম বিসিএস]

(ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম
(খ) বাংলাদেশের পোশাক শিল্প
(গ) পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার
(ঘ) রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধান
(ঙ) স্বদেশপ্রেম

❖ যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৩৭তম বিসিএস]

(ক) মানবসম্পদ
(খ) বাংলাদেশের নগরায়ন
(গ) সাইবার অপরাধ
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
(ঙ) চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় আসা রচনাসমূহ

❖ যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৩৬তম বিসিএস]

(ক) বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য

(খ) জাতীয় উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

(গ) শিষ্টাচার ও সৌন্দর্য

(ঘ) বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় ও তার প্রতিকার

(ঙ) নারী উন্নয়ন

❖ যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: [৩৫তম বিসিএস]

(ক) দেশাত্ববোধ

(খ) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

(গ) বার্ধক্য ও বৃদ্ধাশ্রম

(ঘ) সড়ক দুর্ঘটনা

(ঙ) যেদিন সবকিছু গোলমেলে

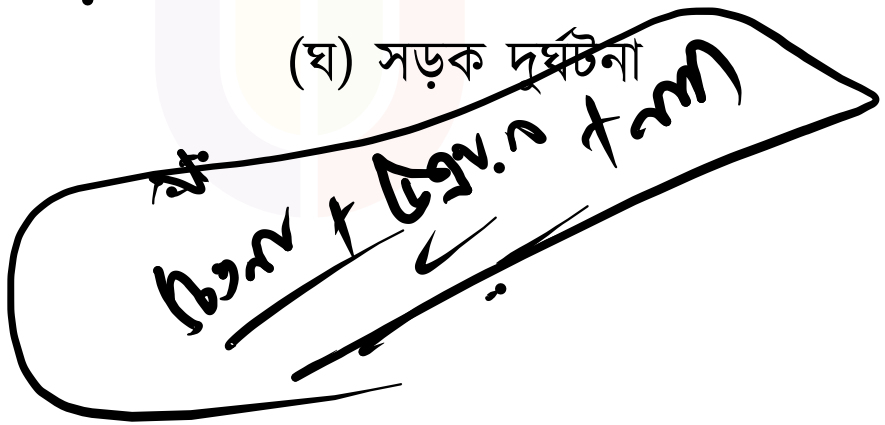

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ **ভূমিকা:** বিশ্বের ক্রমবর্ধমান উন্নতির ধারক শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে পা ফেলে বিজ্ঞান জগতে নব নব আবিষ্কার গণমাধ্যমেও এনেছে বিস্ময়কর বিপ্লব। তারই ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি প্রতিদিনকার সংবাদপত্র, বেতার ও টিভি এবং তার পরই আজকের বিশ্বায়নের যুগে যে বিশেষ ব্যবস্থা আধুনিক জীবনের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে, তা হলো ইন্টারনেট। মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে দেওয়া এই ইন্টারনেট রহস্যময় যোগসূত্র আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর বিশাল আয়তনের গ্রহটাকে ছোট্ট করে এনে দিয়েছে আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে।

❑ **ইন্টারনেট:** ইন্টারনেট কথার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কম্পিউটারগুলোর নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক। অর্থাৎ ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত কম্পিউটারগুলোর নেটওয়ার্ক। বিশ্বের বিভিন্ন নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করলে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে ইন্টারনেট বলে। এটি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।
প্রথম দিকে ইন্টারনেটের নাম ছিল ARPANET। ১৯৬৮ সালের ARPANET ছিল ইন্টারনেটের প্রাথমিক পর্যায়। এ প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধিত হয় আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। তবে চারটি কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ARPANET-এর মাধ্যমে। প্রথম যে চারটি কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় সে কম্পিউটারগুলো লস এঞ্জেলেস, মেনলোপার্ক, সান্তা বারবারা (U.C. Santa Barbara) এবং ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয় (The University of Utah)-তে অবস্থিত ছিল। ১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের জন্য TCP/IP উদ্ভাবনের মাধ্যমে ইন্টারনেটের প্রাথমিক যাত্রা শুরু। ১৯৯২ সালে ইন্টারনেট সোসাইটি (ISOC) প্রতিষ্ঠিত হয়।

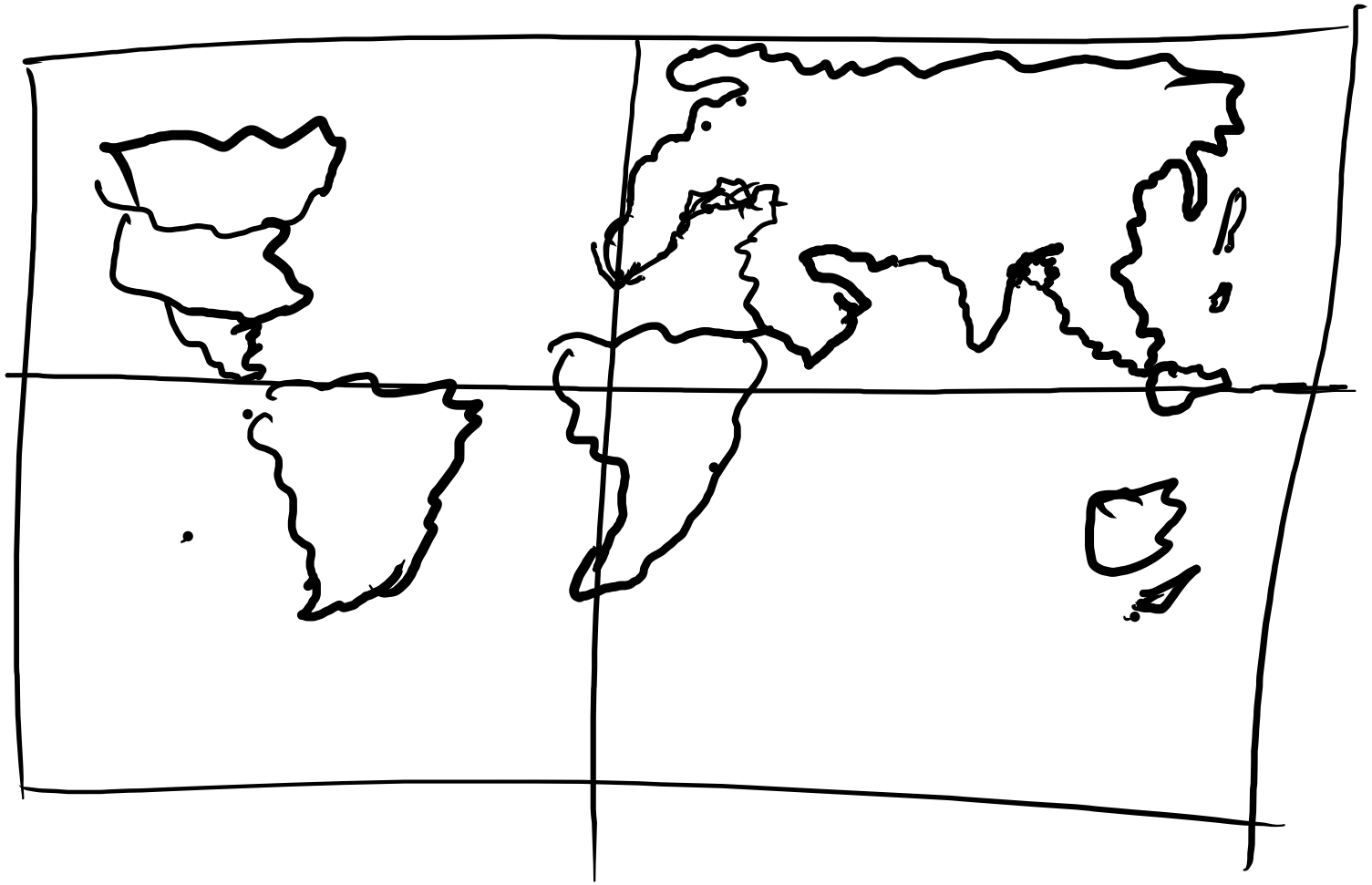

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারকারীকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ব্যবহারকারীকে কোনো সার্ভারের সাথে কম্পিউটার সংযোগ গ্রহণ করে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়। এজন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু হার্ডওয়্যার প্রয়োজন। হার্ডওয়্যারগুলো হলো- কম্পিউটার, মডেম, টেলিফোন লাইন ইত্যাদি। অনেক সময় প্রিন্টার এবং স্ক্যানারের প্রয়োজন হতে পারে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য হার্ডওয়্যারসামগ্রীর পাশাপাশি সফটওয়্যারের গুরুত্ব অপরিসীম। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য সিস্টেম সফটওয়্যার হিসেবে Microsoft Windows NT, XP' Linux ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেবলমাত্র ই-মেইল প্রেরণ বা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত Website হচ্ছে Gmail, আউটলুক এক্সপ্রেস, ইউডোরা প্রো ইত্যাদি। আবার Web pages ব্রাউজ করার সফটওয়্যার হচ্ছে Internet Explorer, Netscape, Google Chrome, Firefox ইত্যাদি। এছাড়া FTP, Ghoper, Telnet ইত্যাদি সফটওয়্যারও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ইন্টারনেট কীভাবে কাজ করে?

১. ইন্টারনেটের সকল কম্পিউটার কমান্ড এবং ডাটা আদান-প্রদানের TCP/IP প্রোটোকল ব্যবহার করে।

২. ইন্টারনেটে যেকোনো কম্পিউটার আরেকটি কম্পিউটারে সাথে সহজেই সংযোজিত হতে পারে। একটি কম্পিউটার প্রথমে লোকাল বা স্থানীয় নেটওয়ার্কের সাথে সংযোজিত হয়, অতঃপর ইন্টারনেট ব্যাকবোনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

৩. একটি কম্পিউটার সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে সংযোজিত হতে পারে, অথবা আরেকটি কম্পিউটারের রিমোট টার্মিনালের সাথে অথবা নেটওয়ার্কের গেটওয়ের মাধ্যমে, যা কোনো TCP/IP ব্যবহার করে।

৪. ইন্টারনেটের সকল কম্পিউটারেরই একটি IP অ্যাড্রেস থাকে এবং প্রায় সকলের একটি ঠিকানা থাকে, যা ডোমেইন নেম সিস্টেম ব্যবহার করে।

৫. বেশির ভাগ ইন্টারনেট অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামই ক্লায়েন্ট-সার্ভার মডেম ব্যবহার করে; ব্যবহারকারী ক্লায়েন্ট প্রোগ্রাম রান করে, যা সার্ভারের কাছ থেকে ডাটা এবং সেবা গ্রহণ করে।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ইন্টারনেটের প্রজন্ম

ইলেকট্রনিক কম্পিউটারগুলো সাধারণত রেজিস্টার, ট্রানজিস্টর, ক্যাপাসিটর এবং ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের সমন্বয়ে তৈরি। ইন্টারনেট হলো আন্তঃসংযুক্ত কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলির একটি সিস্টেম যা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ডিভাইসগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ইন্টারনেট প্রোটোকল স্যুইট ব্যবহার করে। বিবর্তনের অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করে ইন্টারনেট সিস্টেম বর্তমান অবস্থায় এসেছে। ইন্টারনেটের পরিবর্তন বা বিকাশের একেকটি পর্যায় বা ধাপকে বলা হয় ইন্টারনেট প্রজন্ম। ইন্টারনেটের প্রতিটি প্রজন্মে প্রযুক্তি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তির ও বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োগ ও সার্পোটের উপর ভিত্তি করে ইন্টারনেটের প্রজন্মকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। ইন্টারনেট ১.০: প্রি-ওয়েব ইন্টারনেট (১৯৬৫-১৯৮০)
২। ইন্টারনেট ২.০: ওয়েবের উত্থান (১৯৮১-১৯৯৪)
৩। ইন্টারনেট ৩.০: মোবাইল ইন্টারনেট (১৯৯৫-বর্তমান সময়কাল) ও
৪। ইন্টারনেট ৪.০ ভবিষ্যৎ ইন্টারনেট

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ইন্টারনেট ১.০: প্রি-ওয়েব ইন্টারনেট (১৯৬৮-১৯৯৫)

ইন্টারনেটের প্রাথমিক যুগকে ইন্টারনেট ১.০ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা সর্বসাধারণের কাছে তুলনামূলকভাবে অজানা ছিল। প্রাথমিক যুগের ইন্টারনেট ছিল এক জটিল সিস্টেম এবং পরিচালনা করাও ছিল কঠিন। মূলত গবেষণা, জ্ঞান স্থানান্তর এবং নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট ১.০ ব্যবহৃত হত। তবে গ্রিক শিক্ষাবিদরা কিছু বড় বড় কর্পোরেশন এবং কিছু কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট ১.০ ব্যবহার করতেন। এ ধরনের ইন্টারনেটের সাহায্যে কম্পিউটিং রিসোর্স শেয়ারিং, তথ্য বিনিময় করা ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করা হত এবং যেগুলো ছিল মূলত টেক্সচ্যুয়াল ফর্মে ই-মেইল এবং ইউজনেট নিউজগ্রুপ নামে ডিসকাশন গ্রুপ। ইন্টারনেট ১.০ এর সময়কালে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র এবং নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথম প্রজন্মের ইন্টারনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

১. হোস্ট কম্পিউটারের সংখ্যা অনেক কম।
২. নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র এবং অসংগত।
৩. নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
৪. স্পিড বা গতি ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। মূলত 56 kb/s |
৫. মূলত সরকার ও সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত হত।
৬. প্রধানত ই-মেইলের কাজে ব্যবহৃত হত; ইত্যাদি।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ইন্টারনেট ২.০: ওয়েবের উত্থান (১৯৮১-১৯৯৪)

ওয়েব প্রথম আবির্ভূত হয় ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে যখন ইন্টারনেট ব্যবহারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। ওয়েব হলো এমন একটি বৃহৎ সিস্টেম যা অনেকগুলো ওয়েব সার্ভারের মধ্যকার সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত। এসব ওয়েব সার্ভারগুলোতে সারা বিশ্বের ওয়েব পেজগুলো সংরক্ষিত থাকে। মূলত সারা বিশ্বের ওয়েব পেজগুলোর সংগ্রহই হলো ওয়েব। ১৯৮৯ সালে যুক্তরাজ্যের Sir Tim Berners Lee, Sir Sam Walker এবং বেলজিয়ামের Robert Cailiau সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত CERN (The European Center for Nuclear Research)-এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের আবিষ্কার করেন। তবে ওয়াইড ওয়েব ওয়ার্ল্ড বহুল প্রচলন শুরু হয় ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে Mosaic নামক গ্রাফিক্যাল ওয়েব ব্রাউজার আবিষ্কারের এক বছর মূলত ইন্টারনেট ২.০ এর সময়কালে ওয়েবের উদ্ভাবন ও প্রচলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়। যার ফলশ্রুতিতে ওয়েব HTML দ্বারা তৈরি ওয়েবপেজের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাফিক্স, টেক্সট, অডিও, ভিডিও ও অ্যানিমেশন প্রর্দশনী করে। তাছাড়া ওয়েব পেজগুলো ই-মেইল, বিভিন্ন অ্যাপস, মিউজিক, নিউজ ইত্যাদি সার্ভিস প্রদান করে থাকে। অবশ্য বিভিন্ন ধরনের ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যারের সাহায্যে ওয়েবপেজগুলোর ব্রাউজিং এর কাজ সম্পাদন করা হয়।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

ইন্টারনেট ২.০ প্রদান করে অনেক বেশি চাহিদাসম্পন্ন কনটেন্টের কানেক্টিভিটি নেটওয়ার্ক। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে তথ্য আদান প্রদানে TCP/IP প্রোটোকল স্যুট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিধায় ইন্টারনেট ২.০ সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য স্বতন্ত্র নেটওয়ার্ক ও নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত বিপুল সংখ্যক কম্পিউটার বা ডিভাইসকে সংযুক্ত করেছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম যেমন ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার ইন্টারনেট ২.০ এর সময় থেকে শুরু হয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের ইন্টারনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

১. হোস্ট কম্পিউটারের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক বেশি।

২. TCP/IP প্রোটোকল স্যুটের ব্যাপক ব্যবহার।

৩. দ্রুত ব্যাকবোন সংযোগের গতি (44.736 Mb/s)।

৪. সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

৫. ওয়েব ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের ব্যাপক প্রচলন।

৬. DNS সার্ভারের অত্যধিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ইন্টারনেট ৩.০: মোবাইল ইন্টারনেট (১৯৯৫-বর্তমান সময়কাল)

GPRS (Genaral Packet Radio Service) এবং EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সিস্টেমই হলো মোবাইল ইন্টারনেট। অবশ্য মোবাইল ফোনে WAP (Wireless Application Protocol) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। ফলে মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য কোনো প্রকার ক্যাবল বা মডেমের প্রয়োজন হয় না। আর WAP প্রযুক্তি কারণেই মোবাইল ফোনের সাহায্যে খুব দ্রুত ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল আদান-প্রদান, ই-ব্যাংকিং, ই-কমার্স ইত্যাদি কার্যাবলি সহজেই সম্পাদন করা যায়। এমনকি ওয়েবের ন্যায় অ্যাপ্লিকেশনও তৈরি করা যায়।

➢ তৃতীয় প্রজন্মের ইন্টারনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

১. সার্কিট বা প্যাকেট সুইচিংয়ের পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার।
২. উচ্চ গতি সম্পন্ন ডেটা ট্রান্সফার রেট।
৩. উচ্চ গতি সম্পন্ন ফ্রিকুয়েন্সি।
৪. সহায়ক প্রযুক্তির মধ্যে মিথস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি।
৫. আইপি নির্ভর ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সিস্টেমের ব্যাপক উন্নয়ন।
৬. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি যেমন- ফাইবার অপটিক্স, Wi-Max, LTE (Long Term Evolution), Flash- OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার।
৭. মোবাইল ব্যাংকিং, ই-কমার্স, ই-মেইল এবং অন্যান্য ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা প্রদান। ইত্যাদি।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ইন্টারনেট ৪.০ : ভবিষ্যৎ ইন্টারনেট

ইন্টারনেটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক ধরনের ধারণা প্রচলিত আছে। বর্তমানে আমরা অবস্থান করছি ইন্টারনেট ৪.০-এর প্রাথমিক যুগে। ইন্টারনেটে বৈপ্লবিক রূপান্তরকে ইন্টারনেট ৪.০ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা স্থাপন করে বিশ্বের ইন্টারনেট পপুলেশনের লগেস্টিক কনটেন্ট এবং অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য এক শক্তিশালী ভিত্তি।

ইন্টারনেট ৪.০ বিশ্বে সৃষ্টি করছে এক নতুন দিগন্ত। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের নিজস্ব ভাষায় ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্থ প্রজন্মের ইন্টারনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

১. ওয়্যারলেস প্রযুক্তি ক্রমাগত বিকাশিত হতে থাকবে এবং প্রদান করবে অভূতপূর্ব গতিতে সংযোগ করার ক্ষমতা।

২. অতি উচ্চ গতি সম্পন্ন ডেটা ট্রান্সফার রেট।

৩. অতি উচ্চ গতি সম্পন্ন ফ্রিকুয়েন্সি।

৪. সহায়ক প্রযুক্তির মধ্যে সর্বোচ্চ মিথস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি।

৫. Wi-Max, LTE, 5G and LIFI (light fidelity) প্রযুক্তিসমূহ ব্রডব্যান্ড সংযোগের তুলনায় উচ্চ গতি সম্পন্ন ওয়্যারলেস ইন্টারনেট অ্যাক্সেস প্রদান করবে।

৬. বিশ্বের সকলেই সহজে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস বা ব্যবহার করতে পারবে।

৭. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে; ইত্যাদি।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ইন্টারনেট সংযোগ পদ্ধতি

বর্তমানে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের পদ্ধতি আছে। বহুল প্রচলিত পদ্ধতিগুলো হলো- ১. ডায়াল আপ সিস্টেম (Dial-Up System) ২. আইএসডিএন (ISDN) ৩. ব্রডব্যান্ড (Broadband) ৪. ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) ৫. ওয়াইম্যাক্স (WiMax)

❑ ডায়াল আপ সিস্টেম

এ ধরনের পদ্ধতিতে কম্পিউটারের সাথে টেলিফোন লাইন ও মডেম সংযুক্ত থাকে। কম্পিউটার মডেমের মাধ্যমে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আইএসপি (ISP) বা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। তবে ডায়াল আপ পদ্ধতিটি তুলনামূলক সহজ কিন্তু ইন্টারনেটের স্পিড তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

❑ আইএসডিএন

ISDN-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Integrated Service Digital Network এটি নিয়মিত টেলিফোনের বিকল্প এক ধরনের টেলিফোন সার্ভিস। ISDN-এর সুবিধা হচ্ছে এটি নিয়মিত টেলিফোন লাইনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি দ্রুত ডেটা ট্রান্সমিশন বা আদান-প্রদান করতে পারে। তবে এটি সাধারণ টেলিফোন লাইনের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয়বহুল। বড় বড় প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ ডেটা আদান-প্রদান করতে হয়, সেখানে এ ধরনের সার্ভিস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ব্রডব্যান্ড

এ ধরনের সার্ভিস সিস্টেম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার প্রদান করে থাকে। ব্রডব্যান্ড সিস্টেমে ডেটা ট্রান্সমিশন বা আদান-প্রদানের হার অনেক বেশি। তবে তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

❑ ওয়াই-ফাই

Wi-Fi-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Wireless Fidelity। Wi-Fi-এর অপর নাম হচ্ছে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট এক্সেস। অর্থাৎ Wi-Fi হলো তারবিহীন এক ধরনের প্রযুক্তি, যা রেডিও ওয়েব ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) প্রযুক্তিই-বিশ্ব পর্যায়ে মানুষকে জোগাচ্ছে ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস সার্ভিস। তবে Wi-Fi এ ২.৪ গিগাহার্টজ (GHz) ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়। অবশ্য Wi-Fi-এর ডেটা ট্রান্সফার রেট সাধারণত 11 Mbps থেকে 300 Mbps পর্যন্ত হয়ে থাকে।

❑ ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধাসমূহ:

১. ওয়াই-ফাইয়ের কনফিগারে খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
২. আইপি টিভি সেবা প্রদান করে।
৩. যেকোনো মানের Wi-Fi বিশ্বের যেকোনো জায়গায় কাজ করে।
৪. দ্রুতগতির ইন্টারনেট ও অধিক নিরাপদ ব্যবস্থা।
৫. শতাধিক ব্যবহারকারী একক বেজ স্টেশন ব্যবহার করতে পারে।
৬. সহজে নতুন ব্যবহারকারী নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারে।
৭. একাধিক অ্যাকসেস পয়েন্টের জন্য নেটওয়ার্ক রোমিং সুবিধা।
৮. ওয়াই-ফাইয়ের পণ্যের দাম তুলনামূলকভাবে কম।
৯. একই সাথে মাল্টিফাংশনালি সুবিধা পাওয়া যায়।
১০. বর্তমানের Wi-Fi স্ট্যান্ডার্ডগুলো ফ্রিকোয়েন্সি হোপিং সুবিধা প্রদান করে; ইত্যাদি।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ওয়াই-ফাইয়ের অসুবিধাসমূহ:

১. ওয়াই-ফাইয়ের সীমানা নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।
২. দূরত্ব বেশি হলে একাধিক বেজ স্টেশনের প্রয়োজন হয়।
৩. রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।
৪. বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।
৫. ডেটার আদান-প্রদানে নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে।
৬. নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে।
৭. তুলনামূলক কম নির্ভরযোগ্য।
৮. নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ব্যান্ডউইথ কমে যায়।
৯. ঝড়বৃষ্টিতে সিগন্যালের সমস্যা দেখা দেয়: ইত্যাদি।

❑ ওয়াইম্যাক্স

WiMAX-এর পূর্ণরূপ হলো World Wide Interoperability for Microwave Access. বহনযোগ্য কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার সুবিধাকে ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি বলে। এটি একটি তারবিহীন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রযুক্তি। এটি IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ডের ওয়্যারলেস মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক। ২০০১ সালের এপ্রিলে ওয়াইম্যাক্সের জন্ম হয়। বিভিন্ন প্রকার ইন্টারনেট সেবার মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে সীমিত আয়তনের এলাকায় ওয়াইম্যাক্স একটি সহজ ও সুবিধাজনক প্রযুক্তি।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ওয়াইম্যাক্সের সুবিধাসমূহ:

১. অধিক নিরাপদ ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা।

২. ক্যাবল বা তার দ্বারা গঠিত নেটওয়ার্কে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তা মেরামতের প্রয়োজন হয় কিন্তু ওয়াইম্যাক্সে সে ঝামেলা নেই।

৩. যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রেও এখানে বিনিয়োগ এককালীন। সেদিক দিয়ে খরচ অনেক কম।

৪. এর যোগাযোগের আওতা অনেক বেশি হওয়ায় (১০ থেকে ৬০ কিলোমিটার) পথে-ঘাটে যেকোনো জায়গা থেকেই উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা সম্ভব।

৫. ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল বা ভিওআইপি (VoIP) ব্যবহার করে যোগাযোগ হয় আরো সহজে।

৬. শতাধিক ব্যবহারকারী একক বেজ স্টেশন ব্যবহার করতে পারে।

৭. কোয়ালিটি অব সার্ভিসের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৮. একই সাথে মাল্টিফাংশনালি সুবিধা পাওয়া যায়।

❑ ওয়াইম্যাক্সের অসুবিধাসমূহ:

১. অধিক ব্যয়বহুল।

২. দূরত্ব বেশি হলে একাধিক বেজ স্টেশনের প্রয়োজন হয়।

৩. রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।

৪. ঝড়বৃষ্টিতে সিগন্যালের সমস্যা দেখা দেয়।

৫. বিদ্যুৎ খরচ অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় বেশি।

৬. নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ব্যান্ডউইথ কমে যায়।

৭. অন্যান্য ডিভাইস কর্তৃক সিগন্যাল জ্যামের সৃষ্টি হয়।

প্যাকেট সুইচিং নেটওয়ার্ক সর্বাধিক ব্যবহৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে একটি। এটি স্থানীয় বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। এ ধরনের নেটওয়ার্কে সহজেই একাধিক ব্যবহারকারী দ্রুত ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে এবং চ্যানেলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ইন্টারনেট প্রোটোকল

কমিউনিকেশন সিস্টেমে কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ডিভাইস বা অন্য কম্পিউটারের মধ্যে ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াই হচ্ছে প্রোটোকল। অর্থাৎ নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত রীতি-নীতি হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রোটোকল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নেটওয়ার্ক প্রোটোকল হচ্ছে-

- ডাটা লিংক কন্ট্রোল (DLE- Data link control)
- টিসিপি/আইপি (TCP/IP-Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
- নেটবুই (NETBEUI)
- IPX-Internetwork packet Exechange
- এপেল টক (Apple talk)
- এফটিপি (FTP-File Transfer protocol)
- WAP

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় TCP/IP প্রোটোকল।

প্রোটোকলকে নেটওয়ার্কের ভাষাও বলা হয়ে থাকে, যে ভাষা একই নেটওয়ার্কভুক্ত সকল কম্পিউটার বা ডিভাইসের একই হয়। তবে নেটওয়ার্কের সকল ধরনের কাজ একটি মাত্র প্রোটোকল দিয়ে সম্পন্ন করা যায় না। বিভিন্ন ধরনের প্রোটোকলের প্রয়োজন হয়। এরকম একাধিক প্রোটোকল যখন এক সাথে কাজ করে তখন প্রোটোকলসমূহের সেটকে বলা হয় প্রোটোকল স্যুট (Protocol Suit)। যেমন- TCP/IP প্রোটোকল স্যুট। প্রোটোকল স্যুটের একেকটি প্রোটোকল একেক ধরনের কাজ করে।

মূলত ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত প্রোটোকল স্যুট হলো TCP/IP। এটি ল্যান, ম্যান এবং ওয়ান এ বেশি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে খুব সহজেই TCP/IP কনফিগার এবং সেটিং করা যায়।

❑ আইপি অ্যাড্রেস

IP এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol। ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটি ঠিকানা থাকে। এ ঠিকানাকে বলা হয় আইপি অ্যাড্রেস (IP Address)। তথ্য আদান প্রদানে সাধারণত IP Address ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণ ব্যবহারকারীগণ IP Address এর মাধ্যমে তথ্যাবলি গ্রহণ ও প্রেরণ করে থাকেন। যেমন- 192. 55.130.9 একটি IP address.

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ বিশ্বব্যবস্থায় ইন্টারনেট

ইন্টারনেট এখন আর নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণির মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে ইন্টারনেট। সেইসঙ্গে সারাবিশ্বেই এক নতুন জোয়ার যেন এনেছে এটি। এর বদৌলতে বদলে যাচ্ছে বিশ্বের দৃশ্যপট, বদলে যাচ্ছে সামাজিক-রাজনৈতিক দৃশ্য। ইন্টারনেট তাই বিশ্ব বদলের এক অভিনব হাতিয়ার।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর সংশ্লিষ্টতা আর নতুন কিছু নয়। বরং উন্নত দেশগুলো থেকে শুরু করে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলোতেও মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিকে একীভূত করে নিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্ব যে অবস্থানে আজ দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে তথ্যপ্রযুক্তিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। আরও স্পষ্ট করে বললে বিশেষভাবে কম্পিউটার আর ইন্টারনেটকে ছাড়া আজকের এই বিশ্ব বাস্তবতা কোনোভাবেই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই ইন্টারনেটের আগমন ঘটলেও এর বিশ্ববাস্তবতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠা আরও পরের কথা। চলতি শতকের গোড়া থেকে কম্পিউটার ছাড়িয়ে পড়তে থাকে ঘরে ঘরে। আরও পরে বাজারে আসে স্মার্টফোন। কয়েক বছরে সেই স্থানটিতে ট্যাবলেট পিসিও শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে। কম্পিউটিং ডিভাইসগুলো এভাবে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেছে ইন্টারনেট সংযোগ।

গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বায়নের ধারণা নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই শব্দগুলো ব্যবহার করে আসছি সবাই। তবে সত্যিকারের গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম বোধহয় বলা যায় ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল জগতটাকেই। ২০১৩ সালের দিকে দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স নির্বিশেষে ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত ছিল বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ। ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৩৪৭ কোটি।

ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মকে একটি একক দেশ হিসেবে কল্পনা করলে এর জনসংখ্যা চীনেরও প্রায় দ্বিগুণ হয়। অন্যদিকে এরই মধ্যে আবার কেবল ফেসবুকেরই ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৫০ কোটির উপরে। এই বিপুল পরিমাণ মানুষের উপস্থিতি ইন্টারনেটকে ক্রমেই আরও বেশি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে পরিণত করছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের অপরিহার্য অংশেই পরিণত হচ্ছে ইন্টারনেট। সব মিলিয়ে ইন্টারনেট এখন জীবনের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ সামাজিক যোগাযোগের সাইট

সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলোর কল্যাণে গোটা বিশ্ব এখন অনেক বেশি কাছাকাছি চলে এসেছে। ফেসবুক, টুইটার, ফ্লিকার, ইন্সটাগ্রাম, পিনটারেস্ট, টাম্বলার, সাউন্ড ক্লাউড আর ইউটিউবের কল্যাণে গোটা বিশ্ব এখন পরিণত হয়েছে শেয়ারিংয়ের স্থানে। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে এসব সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট এবং সার্ভিস পেয়েছে অসামান্য জনপ্রিয়তা। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ জানাচ্ছে, তরুণদের বড় অংশটিই এখন অনলাইনে সাইট ও সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তারা জানাচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি তরুণ-তরুণী ব্যবহার করছে ফেসবুক। মেয়েদের ১৮ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত বয়সীদের মধ্যে এই জনপ্রিয়তায় খুব একটা কমতি নেই। একইসাথে ছবি শেয়ারিংয়ের জন্য ইন্সটাগ্রাম কিংবা মাইক্রোব্লগিংয়ের জন্য টুইটারের ব্যবহারও বেড়েই চলেছে।

মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে নতুন যে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, তাকেই বলা হচ্ছে আরব বসন্ত। দীর্ঘদিন ধরে মিশর, তিউনিসিয়ার মতো দেশগুলোতে ছিল একক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা দলের শাসন হতে যে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে, তাই জন্ম দেয় আরব বসন্তের। তবে এই আন্দোলনের পেছনে অন্যতম চালিকা শক্তি ছিল সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলো। ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মই এসব আন্দোলন গড়ে উঠতে এবং বিস্তৃত করতে রেখেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এর ফলশ্রুতিতে বর্তমানেও সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলো মিশর, তিউনিসিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয়। এসব দেশে যারা সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে থাকে, তাদের সিংহভাগ অনলাইনেই তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করতে অভ্যস্ত। কয়েক বছর আগে মিশর বা তিউনিসিয়ায় আন্দোলন চলাকালে একাধিকবার সরকার কর্তৃক ইন্টারনেট থেকে দেশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হলেও বিকল্প মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে ইন্টারনেট সক্রিয় করে তারা। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে অনলাইনে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করার প্রবণতা ছিল যেখানে মাত্র ৩৪ শতাংশ, সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য ইস্যুতে এই প্রবণতা আরও বেশি প্রায় ৭০ শতাংশ। এই প্রবণতাই আরব বসন্ত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলেই মন্তব্য ইন্টারনেট বিশেষজ্ঞ এবং সমাজবিজ্ঞানীদের।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ইন্টারনেট জগতে বাংলাদেশ

বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে অফলাইন ই-মেইল-এর মাধ্যমে প্রথম এদেশে সীমিত আকারে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয় - ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে ইন্টারনেট সবার জন্য উন্মুক্ত হয় - ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৬ সালে দেশে প্রথম ইন্টারনেটের জন্য ভিস্যাট স্থাপন করা হয় এবং আই.এস.এন নামক একটি আইএসপি-র মাধ্যমে অনলাইন ইন্টারনেট সংযোগের বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে। বাংলাদেশের ৭৬ শতাংশ মানুষ মুঠোফোন ব্যবহার করেন। অর্থাৎ ২৪ শতাংশ মানুষের কোনো মুঠোফোন নেই। মুঠোফোন ব্যবহারকারীদের মাত্র ৬ শতাংশের নিজস্ব স্মার্টফোন আছে।আবার দেশের ১১ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে কিংবা তাদের স্মার্টফোন আছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে পাকিস্তান (৮ শতাংশ)। প্রতিবেশী দেশ ভারত এদিক থেকে বাংলাদেশের চেয়ে খুব বেশি এগিয়ে নেই (২০ শতাংশ)।ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম হলেও দেশে নানা কাজে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয়। এর একটি এমন, ৬২ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী চাকরি খোঁজার কাজ এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমেই করছেন।যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের সাম্প্রতিক এক জরিপে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল ৩২টি দেশের ইন্টারনেট ও মুঠোফোন ব্যবহারকারীদের ওপর পরিচালিত এ জরিপ ১৯ মার্চ প্রকাশিত হয়। এসব দেশের প্রাপ্তবয়স্ক ৩৬ হাজার ৬১৯ জন ইন্টারনেট ও মুঠোফোন ব্যবহারকারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। জরিপে ঠাঁই পেয়েছে বাংলাদেশের এক হাজার মানুষের মতামত। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) হিসাবে, দেশে ৪ কোটি ২৭ লাখ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। সংস্থাটি অবশ্য সর্বশেষ তিন মাসে একবার কেউ ইন্টারনেট ব্যবহার করলেই তাকে ব্যবহারকারী হিসেবে গণ্য করে। অন্যদিকে ১২ কোটি ১৮ লাখ মানুষের মুঠোফোন সংযোগ রয়েছে। আর মোবাইল ফোন ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের হিসাবে, দেশে প্রায় ৬০ লাখ মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন।ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ধরন: দেশে মুঠোফোনে ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার করেন ১৮-৩৫ বছর বয়সী ব্যক্তিরা। এ হার ১৫ শতাংশ।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

এর বেশি বয়সী গ্রাহক ৬ শতাংশ। ঘরে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ। মাধ্যমিকের চেয়ে বেশি পড়াশোনা করেছেন, এমন মানুষই বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, ২৪ শতাংশ। এর চেয়ে কম পড়াশোনা করেছেন কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহার করেন এমন মানুষ ৫ শতাংশ। ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারেন এমন ১৭ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। আর ইংরেজি না জানার পরও ৫ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। বাংলাদেশে ৬৯ শতাংশ পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ, ৫৬ শতাংশ রাজনৈতিক খবরাখবর এবং ২৬ শতাংশ সরকারি সেবার তথ্য জানতে এটি ব্যবহার করেন বলে জানান। জরিপ বলছে, ৬২ শতাংশ ব্যবহারকারী চাকরি খুঁজতে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রেও ভারতের (৫৫ শতাংশ) চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে। বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক ইন্টারনেট গ্রাহকদের ৭৬ শতাংশই সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রেও ভারতের (৬৫ শতাংশ) চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৫৬ শতাংশ শিক্ষায়, ৪৮ শতাংশ ব্যক্তিগত সম্পর্কে, ৫০ শতাংশ অর্থনীতিতে, ৩৮ শতাংশ রাজনীতিতে এবং ২৯ শতাংশ নৈতিকতায় ইন্টারনেট ভূমিকা রাখতে পারে বলে মত দেন।কেন মুঠোফোন ব্যবহার: পিউ রিসার্চ বলছে, বাংলাদেশের মুঠোফোন ব্যবহারকারীর ৬৫ শতাংশই মুঠোফোনে ছবি তোলা কিংবা ভিডিও ধারণ করে থাকেন। ভেনেজুয়েলা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে (৭৫ শতাংশ)। বিভিন্ন দেশের মানুষ খুদে বার্তা (এসএমএস) পাঠানো কিংবা চ্যাট করার ক্ষেত্রে মুঠোফোন বেশি ব্যবহার করলেও বাংলাদেশে এ হার কম (৬৭ শতাংশ)। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে ফিলিপাইন (৯৮ শতাংশ)। দেশের ৬ শতাংশ মানুষের নিজের স্মার্টফোন আছে। বাংলাদেশের চেয়েও পিছিয়ে আছে পাকিস্তান (৪ শতাংশ) ও উগান্ডা (৫ শতাংশ)। উদীয়মান দেশগুলোর মধ্যে বেশি নিজস্ব স্মার্টফোন ব্যবহার করে চিলির মানুষ, ৫৮ শতাংশ। আবার বাংলাদেশের ৭৬ শতাংশ মানুষের যেখানে নিজস্ব মুঠোফোন আছে, সেখানে পাকিস্তানের ৪৭ শতাংশ মানুষের নিজের মোবাইল ফোন আছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে ফেসবুকের ব্যবহারও। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের সঠিক তথ্য না থাকলেও দেশে ইন্টারটে ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। সেই সাথে ব্লগও ব্যবহার করে থাকেন বিপুল পরিমাণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী। দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে হয়ে থাকে, তাতেও রয়েছে ইন্টারনেটের বিশাল ভূমিকা। ফেসবুক এবং ব্লগগুলো এই আন্দোলন গড়ে উঠতে এবং একে ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা রাখছে।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

❑ ইন্টারনেট: অপব্যবহার, অতিব্যবহার ও আসক্তি

ইন্টারনেটের যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সমাজ ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি। পাশাপাশি এর অযৌক্তিক ব্যবহার মানবজীবনে বহুবিধ ক্ষতিসাধন বয়ে আনে। প্রয়োজনীয় বিষয়ের বাইরে যেমন অপ্রয়োজনীয় ফেইসবুকিং, অপ্রয়োজনীয় শপিং, ব্রাউজিং, গেইমিং, গ্যামবিলিং, পর্নোগ্রাফি দেখা ইত্যাদিতে ইন্টারনেটের ব্যবহারকে অপব্যবহার বলা হয়। অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কাজ করা হয় যা ব্যক্তির মন ও শরীর নিতে পারে না সেটাকেই অপব্যবহার বলা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এই অপব্যবহার শিশু, কিশোর, তরুণ, যুবক, পূর্ণবয়স্ক, মধ্যবয়স্ক, বয়োবৃদ্ধ – এক কথায় সবাই করছে। শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা বন্ধু সিলেকশন, অ্যাফেয়ার রিলেশন, চ্যাটিং, গেইমিং, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি এগুলিতে অপব্যবহার বেশি দেখা যায়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, পর্নোগ্রাফি, ব্যক্তিত্বের সমস্যা ইত্যাদিতে বেশি আসক্তি দেখা যায়। ইন্টারনেট ব্যবহার মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে ইন্টারনেট ব্যবহার হল অতিব্যবহার। ইন্টারনেটের অতিব্যবহার হল যার ব্যবহার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ যা না হলেও চলে। যার ব্যবহার ছাড়া আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মগুলো ভালোভাবে চালিয়ে নিতে পারি তা হল অতিব্যবহার। ইন্টারনেটের ব্যবহার হতে হবে পরিশীলিত ও যৌক্তিক। এর যথাযথ ব্যবহার করতে না পারলে আমরা উন্নতির দিক থেকে পিছিয়ে যাবো। এতে দেশ পিছিয়ে যাবে, জাতি হিসাবে আমরা পিছিয়ে থাকবো। এর ব্যবহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করতে হবে। ইন্টারনেট আসক্তির জন্য ব্যক্তি কত সময় ধরে ব্যবহার করল সেটার চেয়ে কি ব্যবহার করল সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রচনা/প্রবন্ধ: ইন্টারনেট সংস্কৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা

যেমন কেউ যদি কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনে বা অন্য যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইন্টারনেট দীর্ঘসময় ব্যবহার করে তার মধ্যে আসক্তি তৈরি হয় না কারণ সেটা মস্তিস্কে ডোপামিন সিক্রেশন করে না। কিন্তু যে বিষয়গুলোর কারণে মস্তিষ্কে ডোপামিন সিক্রেশন বেশি হয় সেগুলোতে বেশি আসক্তি তৈরি হয়। যেমন ভিডিও গেমস, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি। ইন্টারনেট আসক্তির মনোবৈজ্ঞানিক কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তুলে ধরা যায়- কোন বিষয়, অবস্থা, ঘটনা, বস্তু, ব্যক্তির সাথে সংযোগ তৈরি হওয়ার ফলে আসক্তির বিষয়টি চলতে থাকে, যে বিষয়গুলো আমাদের আনন্দ দেয় সেগুলো ইতিবাচক বলবর্ধক এর মাধ্যমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, ব্যক্তি যখন হতাশা, বিষণ্নতা, উদ্বিগ্নতা, একঘেঁয়েমিতে থাকে তখন এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আনন্দদায়ক বিষয় খোঁজে। আর আনন্দের উৎস হিসাবে ব্যক্তি ইন্টারনেটের খারাপ ওয়েবসাইট খুঁজে নিতে পারে- এটা নেতিবাচক বলবর্ধক হিসাবে কাজ করে, ব্যক্তি যখন কোন একটা বিষয় দেখে, শুনে অথবা অন্য কাউকে দেখে তখন তার ভালোলাগা থেকে ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যাশা জেগে উঠতে পারে, অন্যের ভালোলাগা দেখে নিজের ভালোলাগা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও আসক্তি আসতে পারে। ইন্টারনেট আসক্তির কালো থাবা সমাজের সর্বত্রই বিরাজমান। এর ফলে শিশু-কিশোররা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি বয়স্করাও এর ভয়াবহ প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। শিশু-কিশোররা ভিডিও গেমস্, ফেইসবুকিং, চ্যাটিং সহ নানাবিধ বিষয়ে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করছে। যার ফলে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে তাদের আচার-আচরণে এবং লেখাপড়ায় যেমন অমনোযোগিতা, কাজে অনীহা, রাত জাগা, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইন্টারনেট আসক্তির প্রভাবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতি, দাম্পত্য সম্পর্কে জটিলতা, পরকীয়া, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ইত্যাদি দেখা যায়। ইন্টারনেট আসক্তির কারণে আরও যেসব ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – সামাজিক দক্ষতা হ্রাস পাওয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা কমে যাওয়া, সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদি, ভালো বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কমে যাওয়া, সামাজিক জীবন বাধাগ্রস্ত হওয়া, পেশাগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, সাইবার ক্রাইমে জড়িয়ে পড়া, বিপদে পড়া, জীবনের স্বাভাবিক রুটিন নষ্ট হয়ে যাওয়া, শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়া ইত্যাদি। ইন্টারনেট আসক্তি থেকে বের হয়ে আসার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে- প্রথমত ব্যক্তিকে স্বীকার করতে হবে যে সে আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, সাধারণত: সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টার বেশি ইন্টারনেটের অপব্যবহারকে আসক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এক্ষেত্রে ধাপে ধাপে আসক্তির মাত্রা কমানো যেতে পারে যেমন পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন সময় কমিয়ে আনা যেতে পারে, প্রতিবার সময় কমানোর সাথে সাথে নিজেকে পুরস্কৃত করা, এই সময়ে যদি মানসিক অবস্থা বেশি খারাপ হয় যেমন- মেজাজ খিটখিটে হওয়া, খারাপ লাগা, হতাশা, বিষণ্নতা, রাগান্বিত হওয়া ইত্যাদি তাহলে মনকে অন্য দিকে সরিয়ে নেয়া যেমন-নাটক, মুভি দেখা, গান শোনা, খেলা দেখা, ছবি আঁকা অথবা এমন কোনো কাজ করা যাতে মন ভালো থাকে, যার যার ধর্মানুযায়ী ধর্মীয় বিধিনিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলা, আসক্তির মাত্রা মারাত্মক আকার ধারণ করলে মনোবৈজ্ঞানিক সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞানী, সাইকোথেরাপিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারেন, যেহেতু এই আসক্তি আমাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করে তাই এই আসক্তির দিকে না গিয়ে আমরা যদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক দক্ষতা অর্জন করতে পারি এবং নানা ধরনের গঠনমূলক কাজে সময় ব্যয় করতে পারি তাহলে সেটা যেমন ব্যক্তির আত্মোন্নয়নে সহায়ক হবে তেমনি এর মাধ্যমে আমরা পরিবার ও সমাজের কল্যাণেও অবদান রাখতে সক্ষম হব। এভাবে ইন্টারনেটের অশুভ প্রভাব থেকে সমাজ তথা রাষ্ট্রকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এ ব্যাপারে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সচেতন সমাজ, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আইন রক্ষাকারী সংস্থা, সরকার তথা সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

❑ উপসংহার

বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে অভাবনীয় উন্নতি, প্রগতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। বিশ্বজোড়া প্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট ব্যবস্থা সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ। সমগ্র পৃথিবী এখন উর্ণনাভের বাঁধনে বাঁধা। ছোট্ট ইউনিটের মুঠোয়-এ ব্যবস্থাকে এড়িয়ে থাকা চলে না।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

- **ভূমিকা:** “এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।”

  -- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শকে ধারণ করে ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে একটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চান। আর এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য চীনের ‘সর্বজনীন পেনশন মডেল’ অনুসরণ করে বাংলাদেশেও ‘সর্বজনীন পেনশন’ বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। সব শ্রেণির বয়স্ক নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে ‘সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা’ ২০২২-২৩ অর্থ বছর থেকে ‘সর্বজনীন পেনশন’ ব্যবস্থা শুরু করেছে বাংলাদেশ সরকার।

- **পেনশন ও সর্বজনীন পেনশন:** একজন সরকারি চাকরিজীবী চাকরি জীবন শেষে মাসিক ভিত্তিতে যে ভাতা পেয়ে থাকেন তা পেনশন নামে পরিচিত। কোনো ব্যক্তি তার চাকুরিতে নিযুক্ত থাকাকালে কিছু অর্থ একটি তহবিলে আলাদা করে যোগ করা হয় এবং সে তহবিল থেকেই ব্যক্তির অবসর গ্রহণের পরে সহায়তা প্রদান করা হয়। পেনশন পাওয়ার শর্ত হলো সরকারি নিয়ম-কানুন অনুসারে ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট চাকরি কাল অতিবাহিত করতে হবে। অন্যদিকে সরকারি চাকরিজীবীদের বাইরে দেশের প্রায় সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের পেনশন ব্যবস্থার মধ্যে আনাই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা। এখানে মূলত সরকার দেশের সকল নাগরিকদের আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে পেনশনের আওতায় নিয়ে আসতে চাচ্ছে।

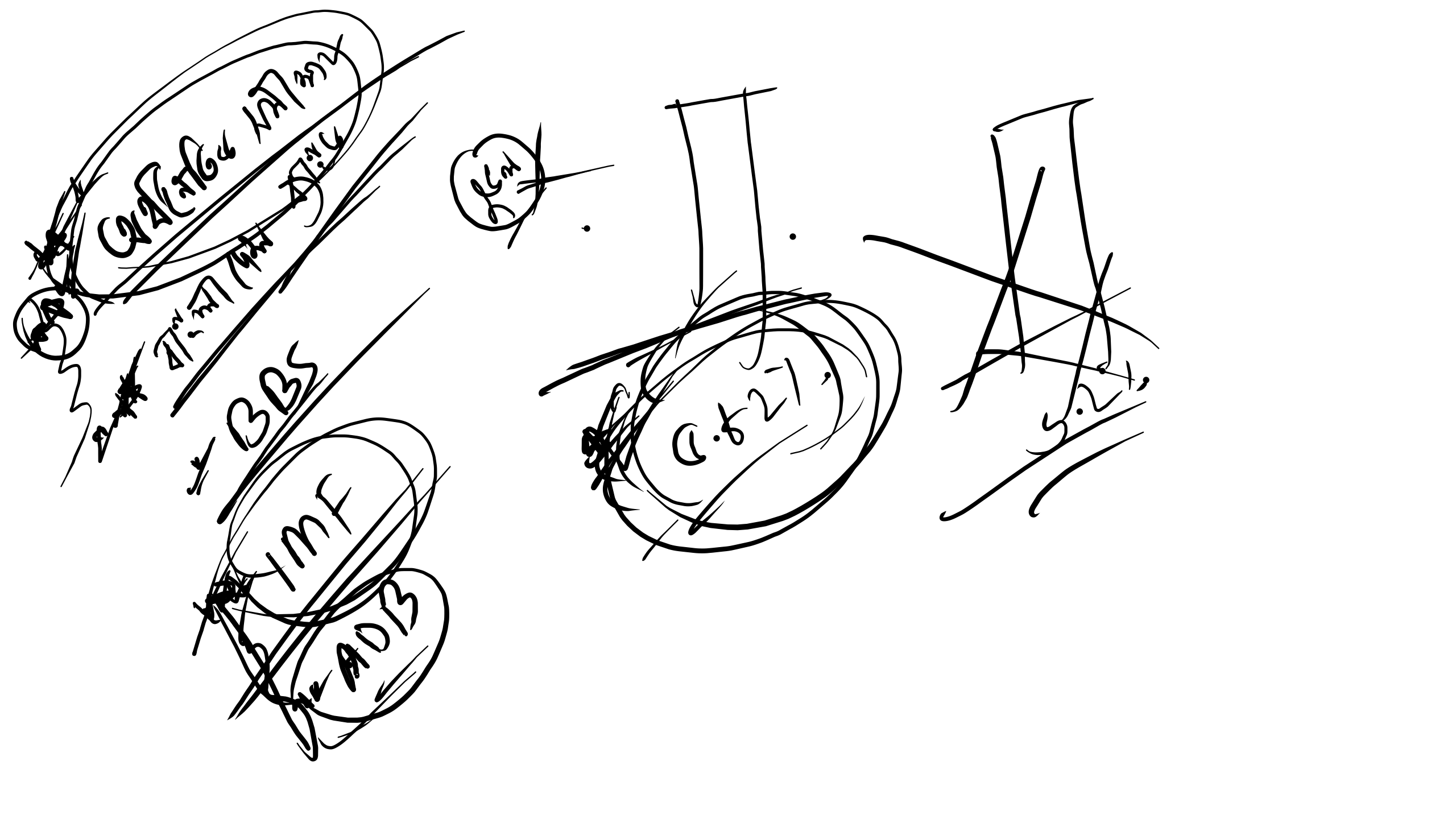

অর্থনৈতিক সমীক্ষা

বাংলাদেশ ব্যাংক

BBS

IMF

ADB

৫.৮২%,

৬.২%,

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

❑ **সর্বজনীন পেনশন আইন:** ১৮ থেকে ৫০ বছরের বয়স্ক নাগরিকদের পেনশনের আওতায় আনতে জাতীয় সংসদে ইতোমধ্যে "সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থপনা বিল ২০২৩" পাস হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬০ বছর বয়সের পর ব্যক্তি আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম. মোস্তফা কামালের মতে, "আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের প্রাপ্ত বয়স্কদের সবাইকে সর্বজনীন পেনশনের আওতায় আনা হবে।"

❑ **সর্বজনীন পেনশন আইনে যা আছে:** যেহেতু দেশের সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্যেই সরকার 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩' গ্রহণ করেছে। এ আইনে যা যা আছে–

☑ সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ধার্যকৃত হারে অংশগ্রহণকারী চাঁদাদাতা কর্তৃক নিরবচ্ছিন্নভাবে চাঁদা প্রদানের শর্তে তাঁর বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হলে আজীবন বা পেনশনে থাকাকালীন চাঁদা মৃত্যুজনিত কারণে তার নমিনিকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাসিক নির্ধারিত হারে পেনশন প্রদত্ত হবে।

☑ পরিচালনা পরিষদ গঠন ও কার্যাবলি

☑ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ তহবিল গঠন

☑ সদস্যদের ঋণ গ্রহণে ক্ষমতা

Japan

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

- ☑ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা
- ☑ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা কীভাবে তদারকি ও মূল্যায়ন হবে।
- ☑ কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- ☑ তহবিলের অর্থের হিসাব ও নিরীক্ষা

❑ **জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা:** 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩' এর অধীন একটি জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, যার নাম হবে 'জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ'। এই কর্তৃপক্ষের স্থায়ী সিলমোহর থাকবে।

❑ **ক্ষমতা:** তহবিলের স্থাবর, অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করবার, অধিকার রাখবার বা হস্তান্তর করবার ক্ষমতা শুধু জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের থাকবে এবং এটি নিজ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং এর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

পেনশন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব: 'সর্বজনীন পেনশন ২০২৩' আইনে পেনশন কর্তৃপক্ষের যে সব দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে–

ক. সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি চালু, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

খ. সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতির আওতায় উহার চাঁদা দাতাগণের স্বার্থ সংরক্ষণ।

গ. সর্বজনীন পেনশন স্কিম গ্রহণ, স্কিমে প্রবেশ যোগ্যতা, শর্ত নির্ধারণ, অনুমোদন, স্কিম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

ঘ. পেনশন স্কিমে চাঁদা দাতাগণের জমাকৃত অর্থের সুরক্ষা নিশ্চতকরণ।

ঙ. চাঁদা দাতাগণের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রতিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করা।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ তহবিল গঠন: 'জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ তহবিল' নামে কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হবে।

ক. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

খ. এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য ফি ও চার্জ।

গ. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ।

ঙ. অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

এই অর্থগুলো কর্তৃপক্ষের নামে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হবে। কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হতে অর্থ উত্তোলন করা হবে।

❑ **সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা:** 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩' এর ১৪ অনুচ্ছেদে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হয়েছে। যথা:

১. জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতায় ১৮-৫০ বছর বয়সী সকল নাগরিক সর্বজনীন পেনশন স্কীমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে বিশেষ বিবেচনায় ৫০ ঊর্ধ্ব বয়সের নাগরিকগণও সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

২. একজন চাঁদাদাতা ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে মাসিক পেনশন পাবার যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং চাঁদা দাতার বয়স ৬০ বছর পূর্তিতে পেনশন তহবিল পুঞ্জীভূত মুনাফাসহ জমার বিপরীতে পেনশন প্রদান করা হবে।

৩. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীগণ এই কর্মসূচিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

৪. সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি স্বেচ্ছাধীন থাকবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

৫. প্রত্যেক চাঁদা দাতার জন্য একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র পেনশন হিসাব থাকবে, যা বিধি দ্বারা পরিচালিত হবে।

৬. চাকুরিরত চাঁদা দাতাগণ চাকুরি পরিবর্তন করলেও পূর্ববর্তী হিসাব নতুন কর্মস্থলের বিপরীতে স্থানান্তরিত হবে, নতুনভাবে হিসাব খোলার প্রয়োজন হবে না।

৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বনিম্ন চাঁদার হার নির্ধারিত হবে।

৮. মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চাঁদা প্রদান করা যাবে এবং অগ্রিম অথবা কিস্তিতে টাকা জমা দানের সুযোগ থাকবে।

৯. মাসিক চাঁদা প্রদানে বিলম্ব হলে, বিলম্ব ফিসহ বকেয়া চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে পেনশন হিসাব সচল রাখা যাবে এবং উক্ত বিলম্ব ফি চাঁদা দাতার নিজ হিসাবেই জমা হবে।

১০. পেনশনারগণ আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন।

১১. পেনশনে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি অবশিষ্ট সময়কাল (মূল পেনশনারের ৭৫ বছর বয়স) পর্যন্ত মাসিক পেনশন পাবেন।

১২. চাঁদা দাতার কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা প্রদান করার পূর্বে মারা গেলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনি কে ফেরত দেওয়া হবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

১৩. পেনশন তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোনো পর্যায় এককালীন উত্তোলনের প্রয়োজন হলে চাঁদা দাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে অর্থের সর্বোচ্চ ৫০% ঋণ হিসাবে উত্তোলন করতে পারবেন। যা চাঁদাদাতার নিজ হিসাবে জমা হবে।

১৪. মাসিক প্রদত্ত চাঁদা আয়কর মুক্ত হবে।

১৫. সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রজ্ঞাপন জারি হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন আয় সীমার নিচের নাগরিকগণের অথবা অস্বচ্ছল চাঁদা দাতার ক্ষেত্রে পেনশন তহবিলে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসাবে প্রদান করতে পারবে।

[**নোট:** সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতিতে সরকারি, আধাসরকারি স্বায়ত্তশাসিত অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং এই ক্ষেত্রে কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের চাঁদার অংশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।]

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত সরকারি ও আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতা বহির্ভূত থাকবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

❑ **সর্বজনীন পেনশনের প্রয়োজনীয়তা:** "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বিধবা, মাতা-পিতাহীন বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার"– [অনুচ্ছেদ ১৫(ঘ), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।]

বাংলাদেশ ২০১২ সালে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেণ্ডে প্রবেশ করেছে যা ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে এসব কারণে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনয়ন করা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: অবসর সময়ে প্রতিটি নাগরিক নিরাপত্তা চায়। আর নিরাপত্তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। সরকার এ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্তা চালু করেছে। প্রতিটি নাগরিক তার অবসর জীবনে সর্বজনীন পেনশন তহবিল থেকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পাবে।

জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি: মানুষের জীবন যাত্রার মান উঠানামা করে অর্থনৈতিক সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় শতকরা ৮০ জনই হলো নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষ। এ মানুষগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ সকল মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হলে সরকারের প্রয়োজন অধিক তহবিল। সরকার এ সর্বজনীন পেনশন ফান্ডের মাধ্যমে এ ৮০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর জীবন মানের কিছুটা হলেও বৃদ্ধি করতে পারবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

বিনিয়োগ বৃদ্ধি: সরকার সর্বজনীন পেনশন ফান্ডের গচ্ছিত টাকা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগ করে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবে তেমনি অলস অর্থের সঠিক ব্যবহারও হবে।

সম্পদের সঠিক ব্যবহার: বিদেশি ঋণ যেমন: IMF, Word Bank, ADB কিংবা উন্নত দেশগুলো থেকে প্রদত্ত ঋণ এড়িয়ে নিজেদের অর্থেই নিজেদের চাহিদা মেটানো সম্ভব। নিজেদের অলস অর্থ ফেলে না রেখে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সঠিক ব্যবহার করা যাবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মান উন্নয়ন: দেশের দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর মান উন্নয়নের জন্য সরকারও তহবিল ব্যবহার করবে। ফলে দেশের দরিদ্রতার হার যেমন হ্রাস পাবে তেমনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মানেরও উন্নয়ন ঘটবে।

•

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা নিয়ে সুশীল সমাজের মতামত: সর্বজনীন পেনশন স্কিমে কোনো নাগরিককেই বাদ দেয়া যায় না। এটি একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জাল হিসাবে কাজ করে। করোনার পরে সর্বজনীন পেনশন বিষয়টি অনেক দেশেই গুরুত্ব পাচ্ছে। যাদের আয় কম, তাদেরকে এই পেনশনের আওতায় রাখতে হবে এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমাও থাকা উচিত নয়।”

--অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

"সরকার যে সর্বজনীন পেনশনের কথা বলছে সেটা আসলে কন্ট্রিবিউটরি পেনশন ব্যবস্থা। যেখানে সদস্য একটি নির্দিষ্ট অর্থ জমা রাখবে তার বিপরীতে সরকারও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখবে এবং সময় শেষে পেনশন হিসাবে প্রদান করবে। এটি অত্যন্ত কার্যকর একটি পদক্ষেপ।" -- ড. নাজনীন আহমেদ, কান্ট্রি ইকোনমিস্ট, UNDP.

"এখানে তো বড় আকারের একটা ফাণ্ড গঠন হবে। সেটা কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কীভাবে বিনিয়োগ হবে, সেটার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন এই পেনশনের কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, পুরো ব্যবস্থাকে ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে নজরদারি করা। দ্বিতীয়ত, যে কর্তৃপক্ষ থাকবে তারা যাতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত ঠিকভাবে নিতে পারেন সেটা দেখা। তৃতীয়ত, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা"

-- ড. মুস্তাফিজুর রহমান, অর্থনীতিবিদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

❑ **সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ:** COVID-19 ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বর্তমানে দেশে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়ন করা বেশ কঠিন হতে পারে। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে যে চ্যালেঞ্জগুলোর সম্মুখীন হতে হবে–

- সর্বজনীন পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ।
- সর্বজনীন পেনশন তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দুর্নীতির মাধ্যমে যেন এই তহবিল ব্যবহার না হয়।
- বিনিয়োগ করা, বিনিয়োগকৃত অর্থ মুনাফাসহ ফিরানো যাবে কিনা তা নিশ্চিত করে বিনিয়োগ।
- সদস্য ও কর্তৃপক্ষের মাঝে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
- সকল নাগরিককে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

❑ সর্বজনীন পেনশন চালু:

- জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরে অন্তর্ভুক্তির বয়স: ১৮-৫০ বছর।
- বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বছর ঊর্ধ্ব বয়সের নাগরিকগণও সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে স্কিমে অংশগ্রহণের তারিখ হতে ১০ বছর চাঁদা প্রদান শেষে তিনি যে বয়সে উপনীত হবেন সে বয়স হতে আজীবন পেনশন পাবেন।
- সরকারি নির্দেশনা ব্যতীত সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ সরকারি পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
- বিদেশে কর্মরত দেশি কর্মীরা এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।
- জমাকৃত অর্থ একবারে উত্তোলন করা যাবে না।
- পেনশন শুরু: ৬০ বছর পেরোলে।
- ঋণ সুবিধা: জমানো টাকার ৫০%।
- চাঁদার টাকা: কর রেয়াত সুবিধা।
- পেনশন: আয়করমুক্ত।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

❑ চাঁদা জমা

- মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক।
- টানা ১০ বছর দিতে হবে।
- মাস পার হলে পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য বিলম্ব ফি ১%।
- টানা তিন কিস্তি না দিলে পেনশন স্থগিত।
- চাঁদার টাকা অগ্রিম জমা দেওয়া যাবে।
- কর্মহীন হলে অসচ্ছল চাঁদাদাতা ঘোষণার আবেদন।
- ব্যাংক, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস।

❑ নমিনি

- বেঁচে থাকলে আজীবন পেনশন, ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি অবশিষ্ট সময়কালের (পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত) জন্য মাসিক পেনশন পাবেন।
- নমিনি মারা গেলে নতুন নমিনি মনোনয়ন।
- পেনশনার ও নমিনি মারা গেলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ও উত্তরাধিকার সনদের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারী পেনশন পাবেন।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

❑ অনলাইনে নিবন্ধন

- www.upension.gov.bd ওয়েবসাইটে।
- ভুল তথ্য দিলে বাতিল।
- অনলাইন ফরম পূরণ অথবা সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় গিয়ে নিবন্ধন করা যাবে এবং চাঁদা দেওয়া যাবে।

৪টি আলাদা স্কিম নিয়ে সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। এগুলো হলো- প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা।

- **প্রবাস:** বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী বাংলাদেশি নাগরিক নিম্নে উল্লেখিত চাঁদার সমপরিমাণ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদানপূর্বক এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমপরিমাণ অর্থ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে স্কিম পরিবর্তন করতে পারবেন, তবে পেনশন স্কিমের মেয়াদ শেষে পেনশনার দেশীয় মুদ্রায় পেনশন পাবেন। প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রায় চাঁদা দিয়ে মুনাফা ছাড়াও ২.৫% প্রণোদনা পাবেন।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

- **প্রগতি:** বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো কর্মচারি বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদান করে এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কর্মচারীগণের জন্য এই স্কিমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্কিমের চাঁদার ৫০% কর্মচারী এবং অবশিষ্ট ৫০% প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে। কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই স্কিমে অংশগ্রহণ না করলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো কর্মচারি নিজ উদ্যোগে এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

- **সুরক্ষা:** অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যেমন- কৃষক, রিক্সাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে তাঁতি, ইত্যাদি নিম্নে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদান করে এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

- **সমতা:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) কর্তৃক, সময় সময়, প্রকাশিত আয় সীমার ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের ব্যক্তিগণ [যাদের বর্তমান আয় সীমা বাৎসরিক অনূর্ধ্ব ৬০ হাজার টাকা] নিম্নে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সমতা স্কিমে কর্তৃপক্ষ সমপরিমাণ অর্থ জমা করবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় থাকা ব্যক্তিগণ তাদের জন্য প্রযোজ্য স্কিমে অংশ নিতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, স্কিমে অংশগ্রহণ করার আগে সংশ্লিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা অর্পণ করতে হবে।

রচনা/প্রবন্ধ: সর্বজনীন পেনশন

❑ **পরামর্শ:** অর্থনীতি বিশ্লেষক ও সুশীল সমাজের মতামত পর্যবেক্ষণ করলে যে সুপারিশগুলো দাড় করানো যায়--

- পুরো ব্যবস্থাকে ডিজিটাল প্লাটফর্মে নিয়ে আসা যেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয়।
- কর্তৃপক্ষ বোর্ডে যারা থাকবে তাঁরা যেন তহবিলের অর্থ বিনিয়োগে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা তদারকি করা।
- সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা যেন হয় নাগরিকের একটি অধিকার। যে অধিকার পালনে রাষ্ট্র বাধ্য থাকবে।
- কর ব্যবস্থার সঙ্গে পেনশনকে যুক্ত করা হলে দেশে করদাতার সংখ্য বাড়বে এবং সরকারের রাজস্বও বাড়বে।
- প্রতিটি নাগরিক যেমন: অস্বচ্ছল, দরিদ্র, সরকারি, বেসরকারি কর্মচারী সকলে যেন সমান মর্যাদা পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

❑ **উপসংহার:** সর্বোপরি, এই বৃহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যেমন অর্থ সংগ্রহের চ্যালেঞ্জ থাকবে তেমনি থাকবে তা বাস্তবায়নেরও। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার এর সঠিক বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবে বলে আমি মনে করি। আর এজন্য প্রয়োজন সরকারের পাশাপাশি নাগরিক, সুশীল সমাজ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা। আশা করা যায়, এটি নিশ্চিত হলে বাংলাদেশ চীনের মতো 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা' সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে এবং এর সুফল দেশের প্রতিটি নাগরিক ভোগ করতে পারবে।

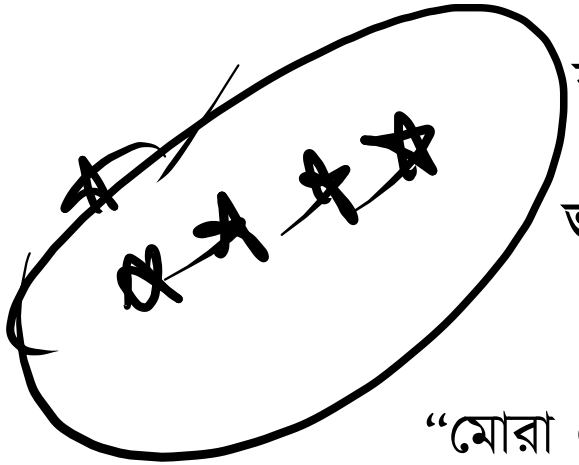

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম
অথবা,
ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ

[৩৮তম বিসিএস]

ভূমিকা:

"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি,
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ...।" -গোবিন্দ হালদার

গত একশ বছরের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ। পরাধীন জাতির স্বপ্ন-সাধ ও মর্যাদা বলতে কোনো কিছু থাকে না। এজন্য কোনো জাতিই পরাধীন থাকতে চায় না। পরাধীন জাতি শোষিত ও বঞ্চিত হতে হতে এক সময় তার মধ্যে জন্ম নেয় সংগ্রামী চেতনার। আর এ সংগ্রামী চেতনাই মানুষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ হিসেবে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা বাঙালি, বাংলাদেশের অধিবাসী। কিন্তু এ দেশ একসময় পরাধীন ছিল। আমরা ছিলাম পরাধীন দেশের নাগরিক। সুদীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী এক স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আজ আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের নাগরিক। বিশ্ব দরবারে আমরা বীর বাঙালি হিসেবে পরিচিত। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

.

তবে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস বেদনার ইতিহাস হলেও তা গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে নানা ঘটনা-উপঘটনা বাংলাদেশকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনাগুলোই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির নিয়ামক।

পূর্ব ইতিহাস: ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের আগে পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান-প্রধান অঞ্চল নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রস্তাব আনা হয়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যুক্তবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব দিলেও ঔপনিবেশিক শাসকেরা তা নাকচ করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি পূর্ব ভারতে আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বহু রাজনৈতিক আলোচনার পর ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে, ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের পূর্বে, হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং বাংলার পূর্ব অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারত প্রজাতন্ত্র দ্বারা বিভক্ত নবগঠিত পাকিস্তান অধিরাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম দুইটি অংশের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল দুই হাজার মাইলের অধিক। দুই অংশের মানুষের মধ্যে কেবল ধর্মে মিল থাকলেও, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে প্রচুর অমিল ছিল। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ অনানুষ্ঠানিকভাবে (পরে আনুষ্ঠানিকভাবে) 'পশ্চিম পাকিস্তান' এবং পূর্ব অংশ প্রথম দিকে 'পূর্ব বাংলা' ও পরবর্তীতে 'পূর্ব পাকিস্তান' হিসেবে অভিহিত হতে থাকে। পাকিস্তানের দুই অংশের জনসংখ্যা প্রায় সমান হওয়া সত্ত্বেও, রাজনৈতিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মাতে থাকে যে, অর্থনৈতিকভাবে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ রকম বিভিন্ন কারণে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে।

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ:

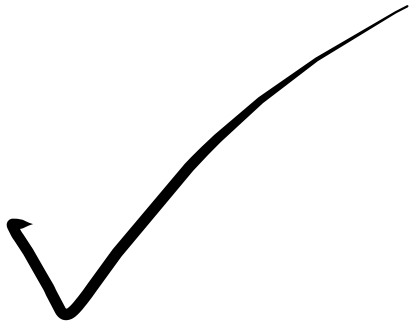

৮. ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ

৭. ১৯৭০ এর নির্বাচন

৬. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

৫. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা

৪. ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন

৩. ১৯৫৬ সালের সংবিধান আন্দোলন

২. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

প্রবন্ধ-রচনা

ভাষা আন্দোলন: ভাষা আন্দোলন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রথম প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মসূচি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে আসছিল। পাকিস্তান সরকার এ যৌক্তিক দাবির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালেই উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ চলতে থাকে যা পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় ১৯৫২ সালে এবং সেই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্ররা একত্রিত হয়। পুলিশ এ জনসমাবেশের উপর গুলি চালানোর ফলে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে শহিদ হয়। এই ঘটনা আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দান করে এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। ১৯৫৬ সালে চূড়ান্তভাবে সংবিধানে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম প্রধান জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

'৫২-এর ভাষা আন্দোলন ছিল একটি সর্বস্তরের ব্যাপক আন্দোলন। এ আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলনের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার বাতিঘর। এটি ছিল একই সাথে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ চেতনার উন্মেষ, স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখে এ ভাষা আন্দোলন। কবির ভাষায় –

"মোদের ভাষার প্রাণ
একুশ করেছে দান
একুশ মোদের পাথেয়
একুশকে করো নাকো হেয়।"

– আব্দুল গাফফার চৌধুরী

প্রবন্ধ-রচনা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন: ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তার দোসরদের শোষণের বিরুদ্ধে এক 'ব্যালট বিপ্লব'। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর তা আরও জোরদার হয়। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম বামপন্থী গণতন্ত্রী দল এবং পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। পূর্ব বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফাভিত্তিক নির্বাচনি ইশতেহার প্রণয়ন করে। এই ২১ দফার প্রথম দফা ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা।

নির্বাচনের ফলাফল: ১৯৫৪ সালে ১০ মার্চ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের আইন পরিষদে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এতে যুক্তফ্রন্ট পায় ২৩৬ = (২২৩+১৩)। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ আসনে যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩টি এবং অমুসলিমদের সংরক্ষিত ৭২ আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ১৩টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাঙালির এই আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি। মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। পরবর্তী সময়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের কৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি করে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়।

১৯৬২ সালের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন: আইয়ুব খান ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এস. এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' নামে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের পেশকৃত রিপোর্টে বলা হয়– "শিক্ষা এমন কোনো জিনিস নয় যা বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে।" আইয়ুব খান ১৯৬২ সাল থেকে এই রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়ন শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ সরকার বিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৪৪ ধারার মধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়।
এ দিন ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের বাধার মুখেও ছাত্রদের মিছিল এগিয়ে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে মোস্তফা ও বাবুল নামে দুজন ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং পরদিন গুলিবিদ্ধ ওয়াজিউল্লাহ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। ছাত্র আন্দোলনের মুখে সরকার শেষ পর্যন্ত শরীফ কমিশন রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত ঘোষণা করে।

'৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন:

'সাঁকো দিলাম স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।'

-জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

•

ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। বাংলাদেশের জন্য এই আন্দোলন এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে একে ম্যাগনাকার্টা বা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদও বলা হয়। মূলত ৬ দফাই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল ভিত্তি।

প্রবন্ধ-রচনা

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়কালে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ন্যূনতম উন্নতি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। বাঙালিদের প্রতি জাতিগত এই বৈষম্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে আহুত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলন' এ শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করেন। ভাষণে তিনি বলেন, "গত দুই যুগ ধরে পূর্ব বাংলাকে যেভাবে শোষণ করা হয়েছে তার প্রতিকারকল্পে এবং পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক দূরত্বের কথা বিবেচনা করে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করছি।" দাবিগুলোর মধ্যে ছিল –

প্রথম দফা	প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন; ফেডারেল রাষ্ট্র।
দ্বিতীয় দফা	কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।
তৃতীয় দফা	পৃথক ও সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা, আলাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
চতুর্থ দফা	কর ধার্য ও শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা।
পঞ্চম দফা	বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা, আমদানি ও রপ্তানির পৃথক পৃথক হিসাব।
ষষ্ঠ দফা	প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন।

ছয় দফার দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ফার্মগেট এলাকায় বিক্ষোভ আন্দোলন চলে। এতে পুলিশের গুলিতে শ্রমিক নেতা মনু মিয়া সহ ১১ জন নিহত হন। ফলে আন্দোলন আরো বেগবান হয়।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান:

"১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান শুধুমাত্র আইয়ুব খানেরই পতন ঘটায়নি, এটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিল।"

-ড. রেহমান সোবহান

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছাত্রসমাজের ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, জরুরি আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ছাত্রসমাজের ১১ দফা এবং জনতার ছয় দফা দাবিকে রাষ্ট্রবিরোধী দাবি বলে ঘোষণা করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা সাজিয়ে অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশের ছাত্রজনতা আন্দোলনে রুদ্ররোষে ফেটে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এ আন্দোলনের ফলে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি আসাদুজ্জামান আসাদ, ২৪ জানুয়ারি মতিউর রহমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুজ্জোহাকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।

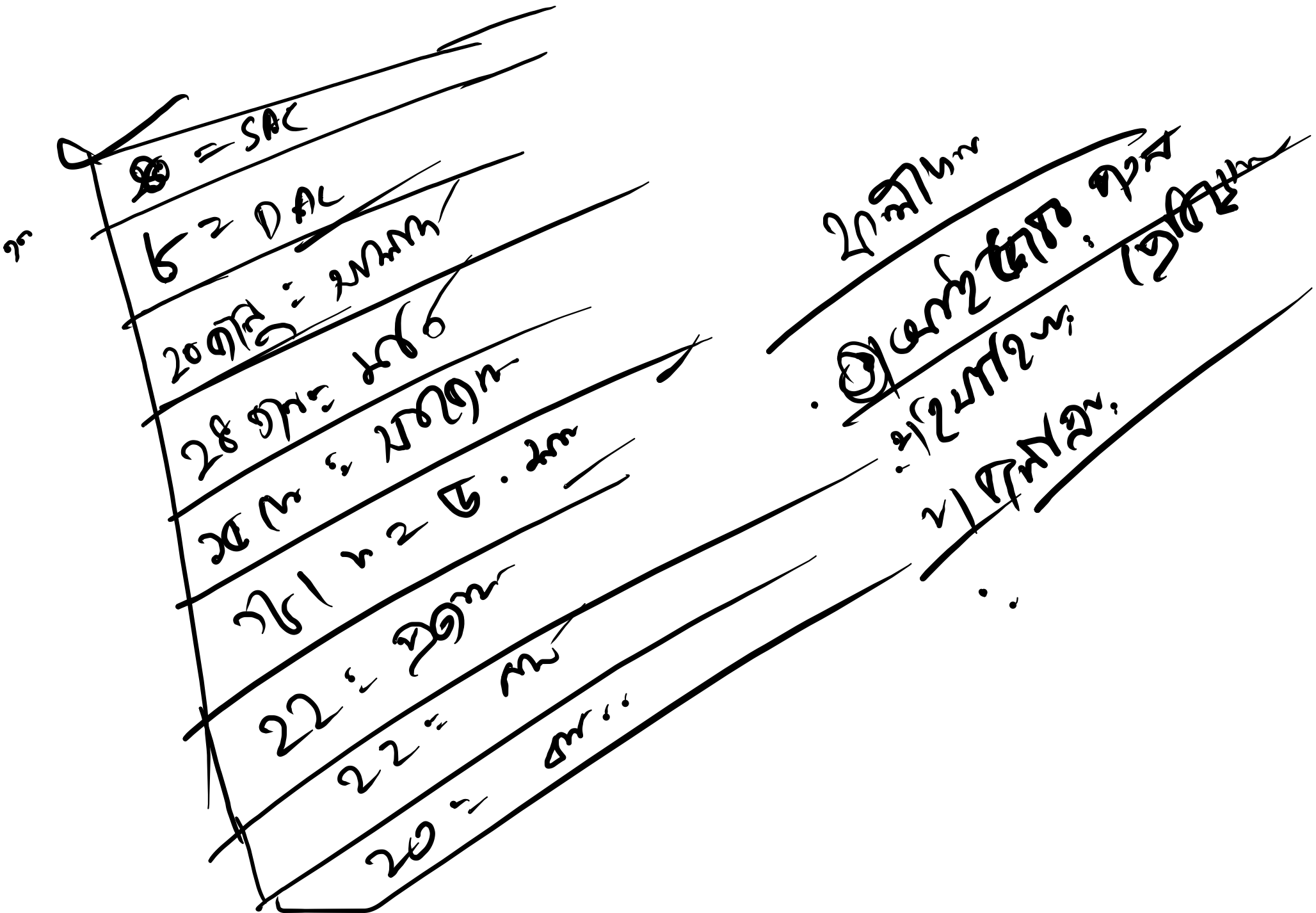

ফলাফল:

- ১২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান।
- স্বৈরাচারী আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

'৭০ এর সাধারণ নির্বাচন:

"১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের মৃত্যুর বার্তাবাহক এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্ন।"

-আবুল মাল আবদুল মুহিত

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনে যেসব ঘটনাপ্রবাহ বিশেষ স্থান দখল করে আছে, ১৯৭০ এর নির্বাচন সেগুলোর অন্যতম। '৬৯-এর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের ফলাফল-

জাতীয় পরিষদ নির্বাচন		প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন (পূর্ব পাকিস্তান)	
দল	আসন সংখ্যা	দল	আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	১৬৭	আওয়ামী লীগ	২৯৮
পাকিস্তান পিপল'স পার্টি (পিপিপি)	৮৮	পাকিস্তান পিপল'স পার্টি (পিপিপি)	২
অন্যান্য	৫৮	অন্যান্য	১০
মোট	৩১৩	মোট	৩১০

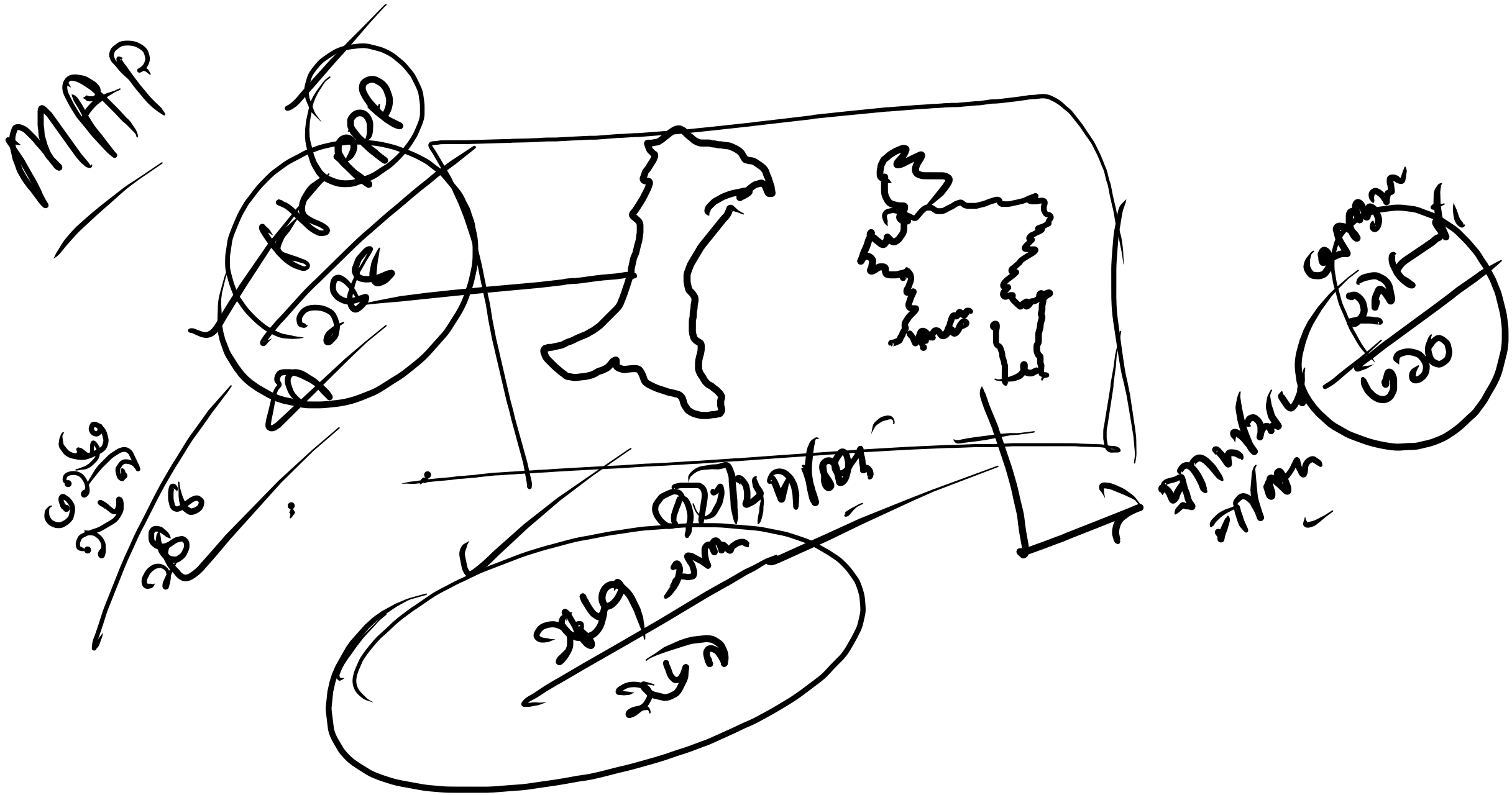
MAP

কিন্তু পাকিস্তান সরকার নির্বাচনের এ ফলাফল শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে। এমতাবস্থায় সর্বস্তরের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
মূলত এ নির্বাচনের মাধ্যমেই ঘোষিত হয় পাকিস্তানের মৃত্যুবার্তা। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করত, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস হয়তো অন্যরূপে আবর্তিত হতো। বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবি করে আসছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির সেই স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে। নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী জনতার চেতনা আরো বেশি বৃদ্ধি পায়, যা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ মার্চের ভাষণ: নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে মত দিতে অস্বীকার করেন। একটি রাজনৈতিক দল জনগণের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পেয়েছে। তারা সরকার গঠন করবে, এটাই ছিল বাস্তবতা। কিন্তু সামরিক শাসকগণ সরকার গঠন বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে এক আলোচনা শুরু করে। কিসের জন্য আলোচনা, এটা বুঝতে বাঙালি নেতৃবৃন্দের খুব একটা সময় লাগেনি। জাতীয় সংসদের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১ মার্চ, ১৯৭১ দেশব্যাপী অসহযোগের আন্দোলনের আহ্বান জানান। সর্বস্তরের জনগণ এক বাক্যে বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে। অসহযোগ আন্দোলন ২ মার্চ শুরু হয়ে ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

๑ มก. : อร่อย (ไม่ หวาน)

๒ มก. : ๆ เค็ม

๓ มก. : ๆ ศักดิ์ๆ

๔ มก. : อร่อย ประมาณ ๒ เท่า

๙ มก. . . .

ๆ:

ইতোমধ্যে ৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক দিকনির্দেশনী ভাষণে সর্বপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। এই নির্দেশ দেশের সর্বস্তরের ছাত্র, জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বাঙালি সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলকেই সচেতন করে তোলে। তাই তো জনগণ দলমত নির্বিশেষে সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। "মূলত ৭ মার্চের ভাষণই ছিলো মুক্তিযুদ্ধের পরোক্ষ ঘোষণা।"

অপারেশন সার্চলাইট ও ২৫ মার্চের গণহত্যা: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কাল রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশে বাঙালি নিধন তথা নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। তাদের পূর্বপরিকল্পিত এই গণহত্যাটি 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত। এ গণহত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগে থেকেই পাকিস্তান আর্মিতে কর্মরত সকল বাঙালি অফিসারদের হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়। ঢাকার পিলখানায়, ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের সামরিক আধাসামরিক সৈন্যদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ২৫ মার্চ রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ধারণা করা হয়, সেই রাত্রিতে একমাত্র ঢাকা ও তার আশেপাশের এলাকাতে প্রায় এক লক্ষ নিরীহ নর-নারীর জীবনাবসান ঘটে। এক পর্যায়ে ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্বাধীনতার ঘোষণা: ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞে সারা বাংলাদেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এমতাবস্থায় গ্রেফতারের আগ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তা ওয়ারলেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করলে সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এরপর ২৭ মার্চ একই বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান আবারও ঘোষণাপত্র পাঠ করলে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর এভাবেই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম গড়ে ওঠে।

This may be last m

অস্থায়ী সরকার গঠন: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা হয় কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমা (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার অন্তর্গত ভবেরপাড়া (বর্তমান মুজিবনগর) গ্রামে। শেখ মুজিবুর রহমান এর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দিন আহমদের উপর। বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে শপথ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পালন শুরু করে। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে ২৬ মার্চ হতে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন ও যুদ্ধের প্রস্তুতি: পাক হানাদার বাহিনীর জ্বালাও-পোড়াও, অত্যাচার-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে জীবন বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্য থেকে কর্নেল (অবঃ) মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী একটি বিরাট গেরিলা বাহিনী ও নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠন করেন। এর পাশাপাশি তিনি বিমান বাহিনী গঠন করেন। বিমান বাহিনী তাদের নিজস্ব বিমান নিয়েই ৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম ও ঢাকায় প্রথম বিমান হামলা চালায়। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক সেক্টরে একজন কমান্ডার নিযুক্ত করেন। এ কমান্ডারদের অধীনে মুক্তিবাহিনী হানাদারদের বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যতই দিন যেতে থাকে ততই সুসংগঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধরীতি অবলম্বন করে শত্রুদের বিপর্যস্ত করে। বিশাল শত্রুবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়েও মুক্তিবাহিনীর মোকাবিলায় সক্ষম হচ্ছিল না।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ: ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষদিকে মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ৬ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশে পাকবাহিনীর সবগুলো বিমান দখল করে নেয়। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়।

পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও চূড়ান্ত বিজয়:

"নিয়াজি রিভলবারের সাথে পূর্ব পাকিস্তানকেও এদের হাতে তুলে দিল।"

-সিদ্দিক সালিক

১৪ ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ঢাকার মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি হাজার হাজার উৎফুল্ল জনতার সামনে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। প্রায় ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে, যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয় ধরা দেয় যুদ্ধ শুরুর নয় মাস পর। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের।

উপসংহার:

"স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা অবিনাশী গান
স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।"

– শামসুর রাহমান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে মিশে আছে এদেশের ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী তথা আপামর জনতার রক্তিম স্মৃতি। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তির যে সনদ রচিত হয়েছিল, স্বাধীনতাযুদ্ধে হানাদার পাকবাহিনীকে পরাজিত করে সে সনদের যথার্থ মান রক্ষিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বীর বাঙালি বর্বর পাকবাহিনীর কাছ থেকে স্বাধীনতার সেই রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল; স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বের মানচিত্রে তৈরি হয় লাল-সবুজের পতাকা এবং আমরা পরিচিত হই বাঙালি হিসেবে। এ অর্জন বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেয়। তাই এ অর্জন ধরে রাখার পাশাপাশি আমাদের সবার মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের মতো দেশাত্মবোধে জেগে উঠতে হবে- তবেই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত সার্থকতা প্রতিফলিত হবে।

প্রবন্ধ-রচনা

- জাতীয় উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম/ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ।
- সুশাসন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত/আইনের শাসন ও বাংলাদেশ।
- গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ/বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা: সমস্যা ও সম্ভাবনা।
- মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
  মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।
- বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি।
- স্বদেশপ্রেম/দেশাত্মবোধ।
- সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ।
- বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি/সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।
- কর্মমুখী শিক্ষা/বৃত্তিমূলক শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা।

লেকচার-১২

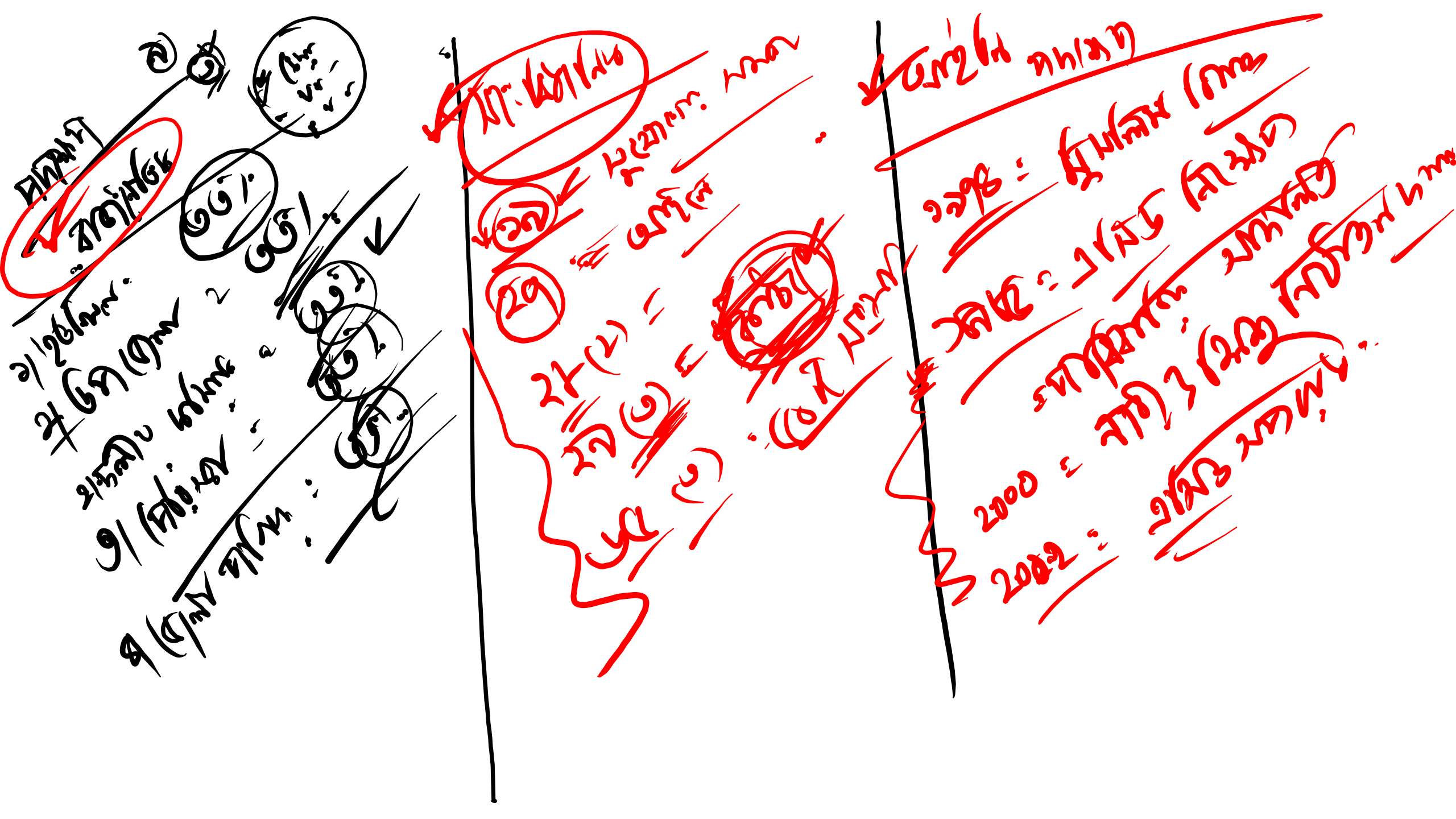

ওকালতনামা

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী [illegible] পিতা/স্বামী [illegible] সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা [illegible] এই মর্মে [illegible] আমার/আমাদের [illegible] মামলা [illegible] আমার/আমাদের [illegible] আমার/আমাদের [illegible] আমার/আমাদের

প্র. ১৩ [illegible] কবিতা

নদী : পুরাতন [illegible] [illegible]

ক্ষিতি, অতিক্রম [illegible]

উত্তর

১. [illegible]

২. [illegible]

৩. মানসী ও সোনার তরী, মানসী

১১শ. সং

[illegible] [illegible]

২০। : [illegible] : [illegible] : [illegible] : [illegible] [illegible]

২১। : [illegible] : [illegible] : [illegible] : [illegible] : [illegible]

২৩। : [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সারাংশ/সারমর্ম

➤ অনেকে বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোনো কাব্যের মধ্যে যদি-বা কোনো বিশেষ শিক্ষা থাকে, তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাহারা আগ্রহ সহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন, আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুম্ভফুল হইতে কেহ-বা তাহার রঙ বাহির করে, কেহ-বা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ-বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ-বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ-বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ-বা নীতি, কেহ-বা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ-বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না।

[৪৫তম বিসিএস]

সারাংশ: কাব্য বা কোন সাহিত্যকর্মের মাঝে লুকায়িত থাকে বহুমুখী রুপ-রস বা নির্যাস এবং পাঠক সেই কাব্য পাঠ করে তার স্বকীয় প্রজ্ঞা ও পাঠকমননের সহায়তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা উপলব্ধি করেন এবং এর রস আস্বাদন করেন। এখানেই কাব্যের বা সাহিত্যকর্মের সার্থকতা।

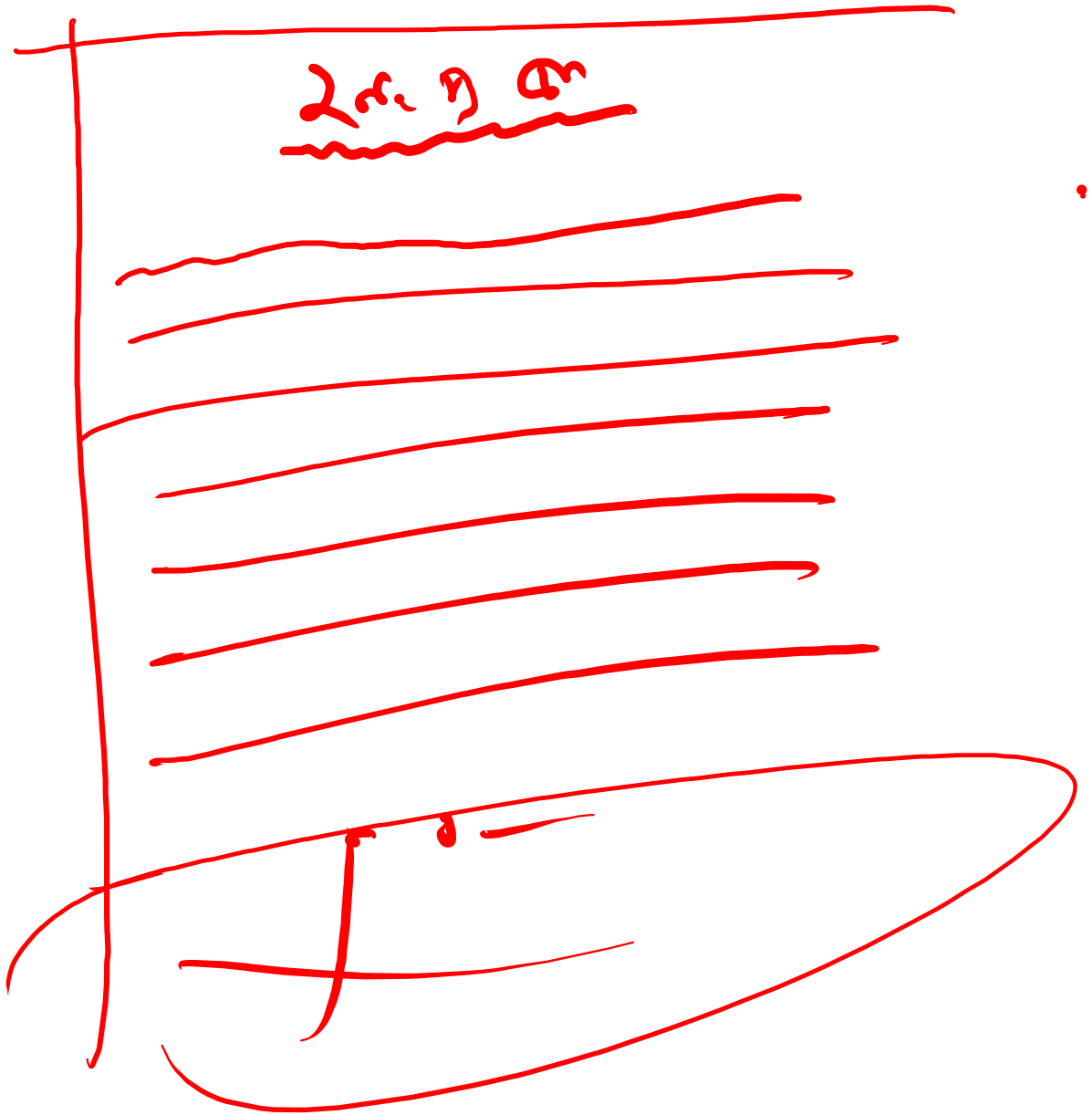

সারাংশ/সারমর্ম

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাওয়ার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে 'মনুষ্যত্ব' কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশের সম্ভাবনা যে অনিবার্য, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

[৩৮তম বিসিএস]

সারাংশ: বর্তমান বিশ্বে মানুষ বিত্তের নেশায় প্রচণ্ডভাবে প্রতিযোগিতায় রত। মনুষ্যত্বের বদলে হৃদয় জুড়ে থাকা বিত্ত লাভের এই নেশা ও লালসা মনুষ্যত্বকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এবং অবক্ষয় ও আত্মবিনাশের পথকে প্রশস্ত করছে। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ এখনই খুঁজতে হবে, নচেৎ আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সারাংশ/সারমর্ম

➢ ধর্মের মতো মতবাদও মনের জগতে লেফট-রাইট করতে শেখায়। ধার্মিকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ভয় আর পুরস্কারের লোভ। সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনে ও-সবের বালাই নেই। তারা সব কিছু করে ভালোবাসার তাগিদে। সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা-বিনা লাভের আশায় ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসা-এরই নাম সংস্কৃতি। তাই ধার্মিকের পুরস্কারটি যেখানে বহু দূরে থাকে, সংস্কৃতিবান মানুষ সেখানে তার পুরস্কারটি পায় হাতে হাতে, কেননা, কাজটি তার ভালোবাসার অভিব্যক্তি বলে তার আনন্দ, আর আনন্দই তার পুরস্কার। সে তার নিজের স্বর্গটি নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। বাইরের স্বর্গের জন্য তাকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হয় না। **[৩৭তম বিসিএস]**

সারাংশ: ধর্ম যেখানে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সংস্কৃতি সেখানে সীমাহীন স্বাধীনতা দিয়ে ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তোলে। সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচার মধ্যেই রয়েছে সংস্কৃতিবানদের ধর্ম। যার ফল হলো .... নির্মল আনন্দ ও তৃপ্তি। অন্যদিকে ধর্মের ফল বহুদুর যার জন্য চেয়ে থাকতে হয় চাতক পাখির মত।

সারাংশ/সারমর্ম

- সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার- এ সবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। **[৩৬তম বিসিএস]**

সারাংশ: ভালো-মন্দ মানুষ নিয়েই সমাজ গঠিত। সমাজের কাজ হলো মানুষকে টিকে থাকার সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু প্রায়ই মন্দ লোকের প্রবল অহংকার সুন্দরকে করে কলুষিত, সমাজের উন্নতিকে করে বিঘ্নিত যার মূলে রয়েছে অহংকার।

সারাংশ/সারমর্ম

➢ প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান। কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতা দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে দেখতে পায়; তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ঐ অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমাবদ্ধ হয়েছিল।

[৩৫তম বিসিএস]

সারাংশ: প্রেমের স্পর্শে অভ্যস্ততার মধ্যেও নতুনত্ব লাভ করা যায়। প্রেমের মাধ্যমে চেতনা যে পরিপূর্ণতা লাভ করে সেই পরিপূর্ণতার মধ্যেই ব্যক্তি সীমার মাঝে অসীমের, নিত্যের মাঝে অনিত্যের, রুপের মাঝে অরূপের সাক্ষাৎ পায়। বস্তুত প্রেমের স্পর্শহীনতাই ব্যক্তির কাছে অসীমকে সীমাবদ্ধ করে রাখে।

সারাংশ/সারমর্ম

- মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না। দুর্বল, অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বুঝে না-অলসকে সে প্রাণপাত করিয়া সেবা করে-ভীরুতার দুর্দশা কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যর্থ হয়।

সারাংশ: মাতৃস্নেহ অতুলনীয় হলেও অতিরিক্ত মাতৃস্নেহ কল্যাণ বয়ে আনে না। বরং সন্তানের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের বিকাশকে করে বাধাগ্রস্ত। অন্ধ মাতৃস্নেহ অবোধ সন্তানের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়; এতে সন্তান ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

সারাংশ/সারমর্ম

- কবিতার শব্দ কবির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির প্রতীক। বাক্যের মধ্যে অথবা পদবন্ধের মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দ আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যারা কবিতা লিখবেন, তাদের মনে রাখতে হবে যে, অনুভূতিদীপ্ত শব্দসম্ভার আয়ত্তে না থাকলে, প্রত্যেকটি শব্দের ঐতিহ্য সম্পর্কে বোধ স্পষ্ট না হলে, কবিতা নিছক বাকচাতুর্য হয়ে দাঁড়াবে মাত্র। কবিতাকে জীবনের সমালোচনাই বলি বা অন্তরালের সৌন্দর্যকে জাগ্রত করবার উপাদানই বলি, কবিতা সর্বক্ষেত্রেই শব্দের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই শব্দকে আমাদের চিনতে হবে।

সারাংশ: কবিতার মূল উপাদান শব্দ। ব্যঞ্জনাময়, অনুভূতিদীপ্ত শব্দের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে কবিতা। সুতরাং কবিতার মাধ্যমে জীবনের সমালোচনা করা হোক কিংবা সৌন্দর্যের জগৎ নির্মাণ করা হোক, কবিতার সার্থকতা নির্ভর করে যথার্থ ভাবব্যঞ্জক উপযুক্ত শব্দ চয়নের উপর।

সারাংশ/সারমর্ম

- নিষ্ঠুর ও কঠিন মুখ শয়তানের। কখনো নিষ্ঠুর বাক্যে প্রেম ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হয় না। কঠিন ব্যবহারে ও রূঢ়তায় মানবাত্মার অধঃপতন হয়। সাফল্য কিছু লাভ হইলেও যে আত্মা দরিদ্র হইতে থাকে, সুযোগ পাইলেই সে আপন পশু স্বভাবের পরিচয় দেয়। যে পরিবারের কর্তা ছোটদের সঙ্গে অতিশয় কদর্য ব্যবহার করে, সে পরিবারের প্রত্যেকের স্বভাব অতিশয় মন্দ হইতে থাকে। শিশুর প্রতি একটি নিষ্ঠুর কথা, এক একটা মায়াহীন ব্যবহার, তাহার মনুষ্যত্ব অনেকখানি কমাইতে থাকে। অতএব, শিশুকে নিষ্ঠুর কথা বলিয়া তাহার সঙ্গে প্রেমহীন ব্যবহার করিয়া তাহার সর্বনাশ করিও না। একটা মধুর ব্যবহার অনেকখানি রক্তের মতো শিশুর মনুষ্যত্বকে সঞ্জীবিত করে। পরিবারের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। ইহাই পরিবারের প্রতি প্রেম।

সারাংশ: নিষ্ঠুর ও কঠিন আচরণ কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না, বরং তা মনুষ্যত্বের বিকাশের অন্তরায়। তাই শিশুর মানসিক বিকাশ এবং পারিবারিক প্রেম ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য একে অপরের সঙ্গে রূঢ় ও কঠিন ব্যবহার পরিহার করে উত্তম ব্যবহার করা উচিত।

সারাংশ/সারমর্ম

➢ ‘বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা’
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়- সে যে আরূঢ় ভণিতা
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্যটীকা, কালি আর কলমের ’পর
ব’সে আছে সিংহাসনে-কবি নয়-অজর, অক্ষর
অধ্যাপক; দাঁত নেই- চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে-আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো-হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

[৩৭তম বিসিএস]

সারমর্ম: সুস্থ সমালোচনা সাহিত্যের খোরাক। বস্তুনিষ্ঠ ও গঠনমূলক সমালোচনা সাহিত্য মূল্যয়নের একটি উৎকৃষ্ঠ পন্থা, এটি যেমন সাহিত্য চর্চার গতিধারাকে বেগবান করে, তেমনি ক্ষুদ্র স্বার্থ আর আক্রোশের বশবর্তী হয়ে কাউকে সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করা সাহিত্য চর্চার অন্তরায়। যথার্থ সমালোচনা তাই সকল কালেই কাম্য।

সারাংশ/সারমর্ম

➢ হে চির-দীপ্ত, সুপ্তি ভাঙাও
জাগার গানে।
তোমার শিখাটি উঠুক জ্বলিয়া
সবার প্রাণে।
ছায়া ফেলিয়াছে প্রলয়ের নিশা,
আঁধারে ধরণী হারায়েছে দিশা,
তুমি দাও বুকে অমৃতের তৃষা
আলোর ধ্যানে।

[৩৬তম, ৩৪তম বিসিএস]

সারমর্ম: মানবসমাজের সর্বত্রই আজ দুষ্ট লোকের দৌরাত্ম্য। তারা নিজেদের স্বার্থে মানুষের শান্তিকে বিনষ্ট করে জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। এ পরিস্থিতিতে এমন নেতৃত্বের প্রয়োজন যিনি তার আলোয় সকলকে আলোকিত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবেন।

সারাংশ/সারমর্ম

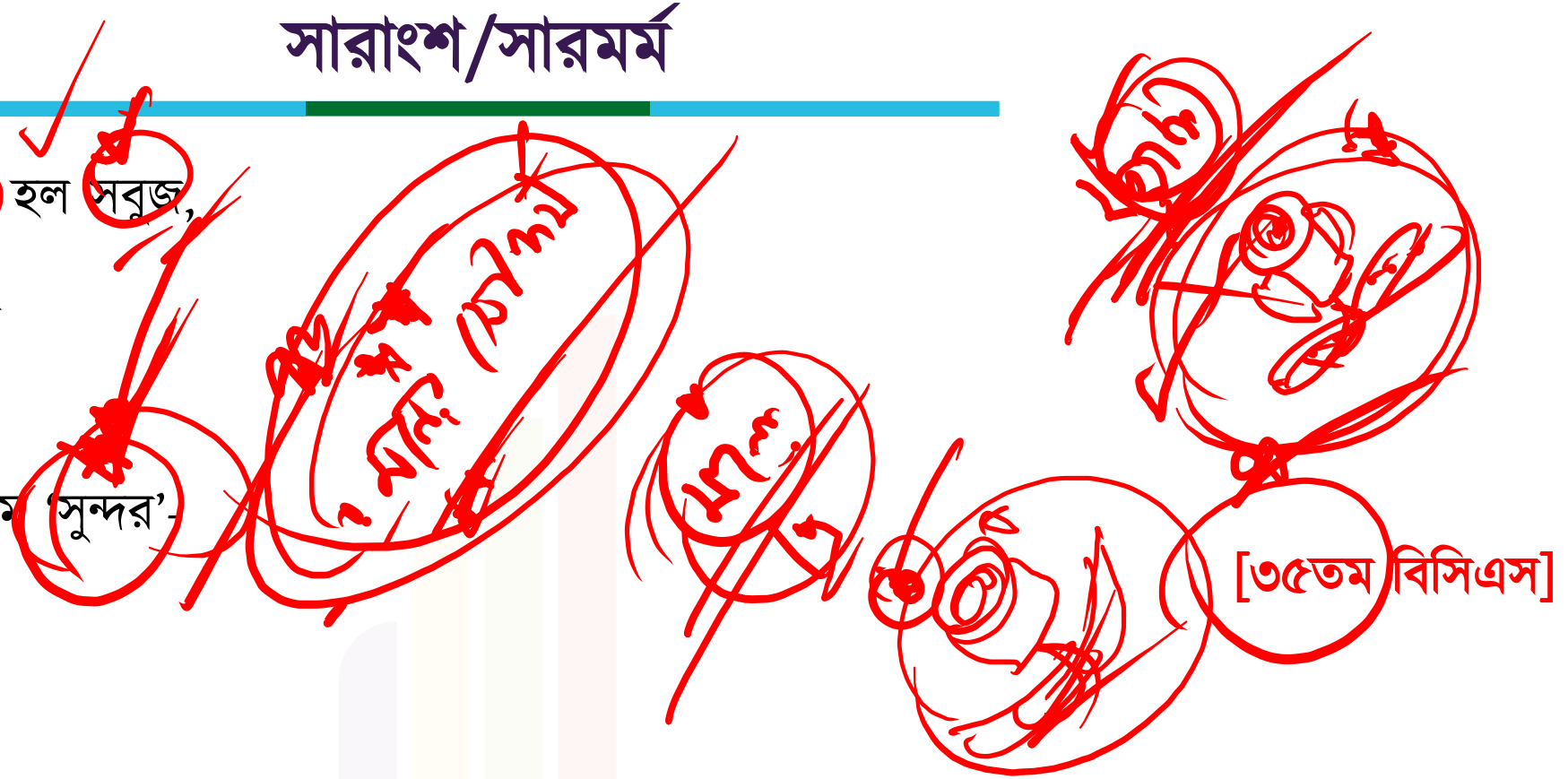

➢ আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'-
সুন্দর হল সে।

[৩৫তম বিসিএস]

সারমর্ম: বস্তুতে নয়, সৌন্দর্য থাকে মানুষের মনে। মানুষের মনের চেতনা আর মননই হলো সৌন্দর্যের আধার। মনের এই সৌন্দর্য দিয়ে যখন কোন বস্তুকে দেখা যায় তখন সে বস্তুটিও সুন্দর দেখায়। সুতরাং মানসজাত সৌন্দর্যের ওপরই নির্ভর করে যাবতীয় বস্তুর সৌন্দর্য।

সারাংশ/সারমর্ম

➢ নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে তো ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে, পবিত্রতা আনে,
সাধকজনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?

[৩৪তম বিসিএস]

সারমর্ম: নিন্দা ও সমালোচনা জ্ঞান ও কর্মের শুদ্ধতা আনয়ন করে মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। নিন্দুকের নিন্দা মানুষকে সঠিক পথে, সৎ কাজে ও মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করে। তাই জাগতিক সাফল্যে সমালোচনার অবদান অনস্বীকার্য।

সারাংশ/সারমর্ম

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার
আলোড়ন নেই, পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

[১৭তম, ১১তম বিসিএস]

সারমর্ম: বর্তমান পৃথিবী নানা জটিলতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। প্রেম-দয়াহীন, নিষ্ঠুর ও জ্ঞানহীন লোকেরা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। অপরদিকে প্রজ্ঞাবান, সৌন্দর্যপিপাসু, মানবপ্রেমিক, দয়ালু ও ন্যায়বান লোকেরা আজ লাঞ্ছিত ও অবহেলিত।

সারাংশ/সারমর্ম

➢ আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবী মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন, –
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

[১৫তম বিসিএস]

সারমর্ম: মানুষ আশবাদী আর এই আশাই জীবনের চালিকাশক্তি, কিন্তু ছলনাময়ী এই আশা কখনো কখনো মানুষকে বঞ্চিত ও প্রতারিত করে। আশার ছলনায় পরে মানুষ হারিয়ে ফেলে তার সবচেয়ে মূল্যবান জীবন, যৌবন ও সময়। তবুও মানুষ আশায় বুক বাঁধে।

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/@/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy